ইভন্ বোয়ারের

এ পিল্‌গ্রিমেজ্

অনুবাদক ঃ

শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভারতী পাব্‌লিশার্স

৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

* দু'টি কথা

নওউইজিয়ান সাহিত্যিক ইহন বোয়ার স্বনামধন্য সাহিত্যিক। তাঁর স্মৃতি প্রসিদ্ধ উপন্যাস "গ্রেট হাঙ্গার" ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় অনূদিত ও আদৃত হয়েছে। "এ পিল্‌গ্রিমেজ" উপন্যাসখানিও তাঁর সৃষ্টিশক্তির পরিচয় সগৌরবে বহন করছে। এই উপন্যাসখানির অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃতার্থ বোধ করছি।

যে সাহিত্যে বিশ্বজনীন সুরটি ঝংকৃত হতে থাকে তা'ই সৎসাহিত্য। উপন্যাসে বর্ণিত বিষয়টি যদি দেশ-কালের অতীত সার্বভৌমত্ব লাভ করতে পারে তবেই তা' অমর সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়। বোয়ারের উপন্যাসের মধ্যে এই বিশ্বজনীন আবেদন আছে। তিনি যে-সমাজের চিত্র এঁকেছেন তা' বস্তুতঃ নওউইজিয়ান সমাজের চিত্র হলেও তা' সকল সমাজের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য।

বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ অতি দুরূহ কর্ম। ভাষান্তরের বিড়ম্বনায় মূল উপন্যাসের অনেক রূপান্তর ঘটে। আবার ঘটনাংশের প্রাঞ্জলতা বজায় রাখতে অনেকখানি পরিবর্জন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, ফলে মূল রসের আস্বাদন হতে কিছুটা বঞ্চিত হতে হয়। তবে মূল বর্ণিতব্য বিষয়টি যদি অবিকৃত থেকে থাকে তবেই অনুবাদক ক্ষমার দাবী উত্থাপন করতে পারেন।

বর্তমান উপন্যাসের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় এই যে, মানুষের জীবন জটিলতম গ্রন্থির সমষ্টি মাত্র। মানুষ নিয়তি-চক্রের দাসরূপে কাজ ক'রে যায়। পাপকর্মই হোক আর পুণ্যকর্মই হোক—কোনটাই মানুষের ইচ্ছাধীন ক্রিয়া নয়। মানুষকে অবস্থা-বিপাকে পাপ করতেও হয়,

আবার পাপের ফলভোগও সে এড়িয়ে যেতে পাবে না। উইন বোয়ার তাঁব অধঃপতিতা নাষিকা বেগিণাব জন্যে সর্বদাই তাঁব স্নেহকুঞ্জেব দ্বাব উন্মুক্ত বেখেছেন। বিচাবদণ্ড আন্দোলনেন দায়িত্ব সাহিত্যিকেব নয়—তাঁব প্রধান ভূমিকা সত্যদ্রষ্টার ও সত্যস্রষ্টাব।

৩১, সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা—২৯
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৩

বিনীত
অনুবাদক

জীবন-মৃত্যুর পারে
দেখা হবে বারে বারে

এক

ক্রিষ্টিয়ানা সহরের আকার্স ষ্ট্রীটের প্রসূতিসদনটি অত্যন্ত নিরানন্দময় একটা দোতলা বাড়ীতে অবস্থিত যার হাতায় শ্যামলতার চিহ্ন মাত্র নাই। এই প্রাচীন বনেদী প্রতিষ্ঠানটির পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ দেড়শ-বছরের ইতিহাস। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হাজার হাজার প্রসূতি এ'টিকে সাময়িক আবাসস্থল হিসেবে দখল করেছে। দখল করেছে কেউ বা আনন্দে, আবার কেউ বা প্রচ্ছন্ন লজ্জার সঙ্গে। ইট-কাঠ-চূণের বাড়ীটা যদি বাঙ্ময় হ'ত এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারত, তা'হলে কত মজার কথাই না প্রকাশ হয়ে পড়ত!

১৮৭৮ সালের মার্চ মাসের এক হাস্যোজ্জ্বল প্রভাতে একজন মহিলা ও তাঁর স্বামী এই প্রসূতি-সদনের বহির্দ্বারে এসে উপস্থিত হ'লেন এবং দরজা-সংলগ্ন মর্চে-ধরা হাতলটা ধরে নাড়া দিলেন। দরজাটি খুলে যেতে তাঁরা বৃক্ষহীন, নিরানন্দ বাগানটি পার হয়ে উঠোনে এসে উপস্থিত হ'লেন। বরফে ও কাদায় প্যাঁচপেঁচে উঠোনটির ওপর সূর্যকিরণ ছল্‌কে পড়ায় এক ধরণের সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। তার সঙ্গে হাসপাতালের গন্ধ মিশে গিয়ে এক অস্বাভাবিক উগ্র গন্ধে স্থানটিকে আমোদিত করে রেখেছে।

হাসপাতালের ভৃত্যটি কোদাল হাতে আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে এল। প্রফেসর কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি বাঁ দিকের সারির একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানালে, প্রফেসর-সাহেব এই সময় সাধারণতঃ ষ্টুয়ার্ডের ঐ ঘরেই বসে থাকেন।

ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে উঠোনে অপেক্ষা করতে বলে, সেইদিকের সিঁড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে জানালেন যে প্রফেসর এইমাত্র ডক্টর-ইন্‌-চার্জের ঘরে গেছেন। অন্যদিকে, প্রধান বিল্ডিং থেকে একটু তফাতে যে লাল ইটের বাড়ীখানা, সেইটা দেখিয়ে দিয়ে ভৃত্যটি বললে, "ডাক্তারের বাড়ী ঐটি।"—অগত্যা ভদ্রলোক আবার সেইদিকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু তিনি খুব বিরক্তভাবে ফিরে এসে বললেন, "কি আপদ! প্রফেসর আবার নাকি এখন ছাত্রদের নিয়ে ওয়ার্ড দেখে বেড়াচ্ছেন।"

ভৃত্যটি কোদাল ফেলে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে, "ঐ যে ঘরটা দেখছেন, তা'হলে ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।"—সদর দরজার ডানদিকে শ্লেট-রঙের যে পাথুরে বাড়ীটা, সে সেইটা দেখিয়ে দিলে। ভদ্রলোকটি আবার গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে সেইদিকে গেলেন। তাঁর স্ত্রী পূর্বের মতই উঠোনে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এবারে ভদ্রলোকটির ফিরে আসতে বেশ দেরী হ'তে লাগল।

অগত্যা তাঁর স্ত্রী অধৈর্যভাবে উঠোনে পায়চারি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার যে কি দাঁড়াবে এই ভাবনায় তাঁর সময় যেন আর কাটতেই চায় না! চল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে তাঁর। নিজের যে আর সন্তানাদি হবে, এ আশা তিনি প্রায় ত্যাগই করেছেন। তাই স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে স্থির করেছেন যে প্রসূতিসদনের একটি ছেলেকে তাঁরা দত্তক নেবেন। এখানকার অসংখ্য ছেলের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নেওয়াও যেমন সহজ হবে তেমনি সেটা একটা পুণ্যকাজও হবে। এই ভেবেই তাঁরা মন স্থির করেছেন। বছর খানেক পূর্বে প্রফেসরকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি বড় সুবিধে করে উঠতে পারেননি। কারণ প্রথমে কাজটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, কার্যকালে দেখা গেল ঠিক তা' নয়। প্রথমতঃ ছেলেটি সুস্থ-সবল হবে, দ্বিতীয়ত তার মায়ের স্বাস্থ্যও যেন ভাল হয় এবং তৃতীয়ত তাঁদের অন্যান্য সর্তগুলিও যেন ঠিক ঠিক পালিত হয়। এতগুলি ব্যাপারের যোগাযোগ ত আর সর্বদাই আশা করা যায় না। মাত্র গতকাল তাঁরা অধ্যাপকের চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছেন।

মহিলাটি ভেবেই চলেছেন:

এখন ঐ একরত্তি শিশুটি বোধ হয় ঐ জানালাগুলির কোন একটার পেছনে ঘুমিয়ে আছে। যাক্‌, আর কিছুক্ষণ বাদেই ত দেখতে পাওয়া যাবে। হয়ত সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে পারবেন

তাঁরা। কিন্তু যদি কোন মানসিক বিকার নিয়ে জন্মে থাকে ছেলেটি? তা'হলে?—দুশ্চিন্তায় শিউরে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর চিন্তা ভিন্নমুখী হ'ল। ভাবলেন, পরের ছেলে কি আর সত্যিই আপন হয় কোনদিন? অজ্ঞাতকুলশীল একটি ছেলেকে নিজের করে নেওয়া ত আর সহজ নয়! কত কিছুই ঘটতে পারে। অন্ততঃ নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না।

মহিলাটি এমনি আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছেন। যে দরজা দিয়ে তাঁর স্বামী অদৃশ্য হয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে, সূর্যকিরণস্নাত উঠোনটিতে অস্থির পদচারণা সুরু করে দিলেন তিনি।

আকাশে কড়া রোদ উঠেছে। হাসপাতালেব ওয়ার্ড থেকে কম্বল আর সতরঞ্চগুলিকে বাইরে আনা হচ্ছে। দূরের ঐ জঙ্গলটির কাছে .নিয়ে গিয়ে ধূলো ঝাড়া হবে। সেই প্রাচীন, নিস্তব্ধ হাসপাতাল বাড়ীটার দেয়াল ভেদ করে এক ধরণের নিরানন্দ ওষুধে-গন্ধ সর্বদা ভেসে আসছে। ঐ রুদ্ধ জানালার অভ্যন্তরে সংঘটিত কত-শত বিষাদ-কাহিনীর বার্তাবহ সেই ঝাঁঝালো গন্ধটি।

দোতলার একটা ঘর থেকে হঠাৎ একটি শিশুকণ্ঠের তীক্ষ্ণ কান্না থেকে থেকে ভেসে আসছে। ভৃত্যটি বরফে ঢেকে যাওয়া একটা নর্দমা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করছিল। মহিলাটি সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "অমন করে কে কাঁদছে বলতে পার?"

ভৃত্যটির হাসি যেন আর থামতে চায় না! কোদালের দিকে

ঝুঁকে পড়ে, রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে করতে সে ত প্রশ্ন শুনে হেসেই খুন! বললে, "তা' কি করে বলব? কান্না ত এখানে অষ্টপ্রহর লেগেই আছে।"

সেই মুহূর্তে মহিলাটির স্বামী ফিরে এসে জানালেন, ডাক্তার তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন। —

এইবার উঠোনটি জনশূন্য হয়ে পড়ল। কোদালটাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে ভৃত্যটি কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাদের আল্‌সে থেকে বিন্দু বিন্দু জল চুঁইয়ে পড়ছে উঠোনে আর ছাদের জলপড়া পাইপ-এর ওপর বসে একটা ছোট্ট পাখী, তার হলুদে ঠোঁটটি আকাশের দিকে তুলে দিয়ে আনন্দের কল-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে।...এমন সময় হাতগুটনো জামা পড়া একজন ধাত্রী ছুটে বেড়িয়ে এসে ভৃত্যটির নাম ধরে ডাক-হাঁক্‌ সুরু করে দিলে। ওদিককার দরজায় ভৃত্যের সাদা মাথাটা দেখা গেল। মুখখানা বেজায় ব্যাজার করে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "ব্যাপারখানা কি শুনি?"

"ডাক্তার তোমাকে দশ নম্বরে ডাকছেন। খুব জল্‌দি!"

"বাব্বা,—কিছু যে মুখে দেবো, তারও কি জো নেই? বলি হঠাৎ কি এমন দরকারটা পড়ল শুনি?"

"একটা লাস বার করতে হবে।"

"ভ্যালা বিপদেই পড়া গেল দেখছি।"—বলে গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে ভৃত্যটি চলে গেল।

এতক্ষণে স্বামী-স্ত্রীকে পক্ককেশ অধ্যাপকের সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় আলাপ করতে দেখা গেল। প্রফেসর শান্তভাবে বললেন, "তা'হলে একটু ইয়ে—করার দরকার, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই চান না যে মেয়েটি আপনাদের দেখে ফেলুক।"

উভয়ে একসঙ্গে—'তা ত বটেই', 'তা ত বটেই' বলে অধ্যাপককে সমর্থন করলেন। মহিলাটি বললেন, "ছেলেটিকে একান্ত নিজেব করে পেতে চাই। ছেলেটির মা যে যখন তখন হুট্ করে গিয়ে হাজির হবেন, তা' হবে না। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও যে এসে ফ্যাঁকরা বাধাবেন, সে'টি চলবে না।—মোট কথা, ছেলেটি যেন তার দু'জন মাকে নিয়ে বিপদে না পড়ে ভবিষ্যতে।"

মাথা নেড়ে প্রফেসর জবাব দিলেন, "সে কথা সত্য! তা' হলে আপনাকে একটু অভিনয় কবতে হবে। দেখবেন বাচ্ছাটিকে দেখে নিজের পার্টটাই ভুলে মেরে দেবেন না যেন!"

প্রফেসর তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। উঠোনটি পার হয়ে তাঁরা কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেছেন এমন সময় মহিলাটি তাঁর হাতটি চেপে ধরে বললেন, "মেয়েটির কি নাম, কই, এখনও পর্যন্ত তা' ত বললেন না?"

"তা এখনও জান্‌তে পারিনি। কোন কথাই সে বলতে চায় না। তাকে আমরা সকলে ৪৭ নম্বরের বলেই ডাকি।"

"মেয়েটা শেষ পর্যন্ত বেঁকে দাঁড়াবে না ত?"

প্রফেসর একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে জবাব দিলেন, "দেখুন, এইসব মেয়েদের আমি বেশ চিনি। আশা করি

এতদিনে এটুকু অভিজ্ঞতা দাবী করবার সঙ্গত অধিকার আমার হয়েছে।”—তারপর অনেকটা যেন স্বগত উক্তি করলেন, “পৃথিবীর মধ্যে এইসব মেয়েরাই হচ্ছে সত্যিকারের দুঃখী। তবু দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।”

স্বল্প-আলোকিত বারান্দা দিয়ে প্রফেসর তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। পর পর কতকগুলো নম্বর দেওয়া ঘর পার হয়ে তাঁরা চললেন। ওরই একটার বাইরে দাঁড়িয়ে অনাবশ্যক চড়া গলায় প্রফেসর বলে উঠলেন, “এ ঘরটাই বা আর বাকী থাকে কেন? এক নজর দেখেই নিন্‌ না।” আগন্তুক দু’জন প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন।

ঘরটার ভেতর থেকে কেমন যেন একটা ওষুধে-মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এল। উত্তর-দুয়োরী বলে ঘরের ভেতরটা তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। দু’দিকের দেয়াল ঘেঁসে লম্বালম্বি বসান মুখোমুখী দু’সারি খাট। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে খাটের সব ক’টি অপরিচিত মুখই তাঁদের দিকে উৎসুক বিস্ময়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে। দু’তিনটি শিশু একসঙ্গে কেঁদে উঠতেই মায়েরা তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। সব ক’টি প্রসূতিই সদ্য কষ্টের তাড়নায় কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে।

দরজার কাছে একজন প্রসূতি বেশ পরিপাটি করে সেজে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। আগন্তুকদের দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠল। প্রফেসর তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ছেলেটি কোথায়?”

মেয়েটি গাব্দা-গোব্দা, তামাটে মুখখানাকে যথাসম্ভব করুণ করে উত্তর দিলে, "শোনেন্ নি বুঝি ? বাছা আমার তিন দিন হ'ল মারা গেছে।"—এই কথা ক'টি উচ্চারণ করে মেয়েটি যেন শোকাবেগে ভেঙ্গে পড়ল।

এতক্ষণে সব ক'টা চোখই আগন্তুকদের পানে নিবদ্ধ হয়েছে। এক ধরণের ঈর্ষা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে প্রসূতিরা তাঁদের তাকিয়ে দেখছে। তাদের বক্তব্যটা যেন এই : সদ্য তাজা রোদ ও টাট্‌কা বাতাস খাওয়া দু'টি প্রাণী সখ করে আমাদের দেখতে এসেছেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা তাঁদের পরিচিত প্রতিবেশে ফিরে যাবেন, আর যতক্ষণ খুসী সেখানকার আনন্দ-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে মজা লুটবেন। আমাদের কথা তখন আর মনেও থাকবে না।

অপর একটি বিছানার সামনে প্রফেসর দাঁড়িয়ে পড়তেই মহিলাটির মনে হ'ল এই মেয়েটিই সম্ভবতঃ সেই মেয়েটি। কিন্তু কাছে যেতেই হতাশভাবে লক্ষ্য করলেন, সেটি একজন মাঝ-বয়েসী বৃদ্ধা।

প্রফেসর অনেকটা পেশাদারী গলায় বললেন, "এই কেস্‌টি বেশ একটু অস্বাভাবিক রকমের ; কেননা, এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইনি প্রথম মা হতে চলেছেন।"

মেয়েটিকে ঘুমন্ত দেখে অভ্যাগতা সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি নিশ্চয়ই নন্, কারণ এঁকে দেখে ত বিবাহিতা বলেই মনে হচ্ছে।"

প্রফেসর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একপ্রকার অর্থসূচক হাসি

হেসে জবাব দিলেন, "ইনি অবশ্য নন্—তবে এঁরও বিবাহ হয়নি।" বলেই লক্ষ্য করলেন, এই কথা শোনা মাত্র মহিলাটি কেমন যেন মুসড়ে পড়েছেন। মাঝ-বয়েসী একজন অবিবাহিতা মহিলার জারজ সন্তানের মা হওয়াটা তিনি যেন কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না—শুনে তিনি খুব অপ্রস্তুত হয়েছেন বলেই বোধ হ'ল। প্রফেসর তাঁর হাত ধরে অপরদিকের সারির মাঝামাঝি একটা খাটের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "আরও একটা মজার ব্যাপার দেখবেন আসুন।"

একজন ফ্যাকাশে ও কুচ্ছিৎ মেয়ে কোলের শিশুটিকে সাপ্‌টে ধবে অবিশ্রান্ত, অসংলগ্নভাবে হেসেই চলেছিল। অধ্যাপক তাকে দেখিয়ে বললেন, "এই যে মেয়েটি দেখছেন, এর যে শুধু মাথাই খারাপ তাই নয়, ও জন্মাবধি পঙ্গু। অথচ মজা দেখুন, সেও আজ নির্লজ্জভাবে সন্তানের জননী হয়ে বসে আছে। আমাদের এই খৃষ্টজগতে কত কি যে মজার ব্যাপারই না নিত্য ঘটছে—তার আর ইয়ত্তা নেই। আপনাদের মত ঘরে বসে মোজা-বোনা সম্ভ্রান্ত মহিলার দল তা' কল্পনাও করতে পারেন না।"

মহিলাটিকে দেখে মনে হ'ল, এবার বুঝি তিনি মূর্ছা যাবেন। স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "ও মেয়েটি নয় ত?"—মহিলাটির সর্ব চিন্তা তখন সেই একই আধারে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

প্রফেসর কিছুটা আত্মতুষ্টির হাসি হেসে বললেন, "আসুন, আপনাকে এবার একটা স্বর্গীয় ছবি দেখাই।"

মহিলাটির দৃঢ়বিশ্বাস হ'ল এবার সেই মেয়েটির কাছেই অধ্যাপক তাঁদের নিয়ে চলেছেন। আশা-আনন্দের দোলায় তাঁর বুক দুরুদুরু ক'রতে লাগল। নিঃশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে ভারী হয়ে এল।

জানালার ধারেব একটি বিছানার কাছে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন। যদিও জানালার খড়খড়ি বন্ধ ছিল তবুও সেই বন্ধ সার্সির ভেতর দিয়ে একফালি রোদ এসে বিছানার বালিশ-রাখা জায়গাটিকে রাঙিয়ে তুলেছিল। বালিসে মাথা রেখে একটি সুস্থ-সবল যুবতী ঘুমিয়ে ছিল। তার এলো ঘন চুলের রাশি বালিসের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত শিশুটির দিকে আনত হয়ে মেয়েটি ঘুমুচ্ছিলো। মেয়েটিকে দেখে মনে হ'ল, শিশুটিকে পরিচর্যা করতে করতে কখন যেন অজান্তে সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। তার নৈশ পোষাকের কয়েকটি খোলা বোতামের ফাঁক দিয়ে তার সুদৃঢ়-শুভ্র কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল দুগ্ধভারে ঈষৎ অবনত একটি সুপুষ্ট স্তনাগ্রভাগ। মেয়েটিকে দেখে মনে হ'ল তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয় এবং সে বেশ সুশ্রীই, যদিও সে অবস্থায় তাকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও রোগাটে দেখাচ্ছিলো।

আগন্তুক মহিলার দৃষ্টি কিন্তু তার কোলের শিশুটির প্রতিই

নিবদ্ধ হ'ল। প্রথম থেকেই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলেটিকে দেখতে সুরু করে দিলেন। এমন তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন যেন ছেলেটি তাঁরই হয়ে গেছে।

পাতলা একমাথা কালো কস্‌কসে্‌ চুলে ছেলেটিকে ভারী সুন্দর ও সবল দেখাচ্ছিল। ছেলেটির একটি সুপুষ্ট হাত তাব মায়ের বুকের ওপব প্রসারিত। থেকে থেকে তার রাঙা ঠোঁট ছুটি ফুলে ফুলে উঠছে। স্বপ্নঘোরে সে যেন জননীর স্তন্যপান করছে। গালছুটি একটু ফোলাফোলা ছেলেটি যেন একটি ক্ষুদ্র দেবদূত বা একগুচ্ছ তাজা যুঁই ফুল—যা' দেখলেই আদর ক'রে, গালের কাছে তুলে ধরে চুম্‌ খেতে ইচ্ছে করে। আগন্তুক মহিলাটির গোটা মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—তা' হলে এই শিশুটির কথাই অধ্যাপক বলছিলেন? শিশুটির পবণে নানা স্থানে তালি দেওয়া সাধারণ একটি পোষাক। অতি পরিচিত হাসপাতালের পোষাক গুলি—যা' যথেষ্ট পরিষ্কারও নয়। মহিলাটির ইচ্ছে করতে লাগল, এখনি ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে, ধুয়ে-মুছে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পড়িয়ে দেন। কতো দীর্ঘ দিন ধরেই না এমনি একটি দেবশিশুকে কল্পনা ক'রে তিনি নিজের হাতে অজস্র জামা-কাপড় বানিয়ে রেখেছেন।

এতক্ষণে তিনি প্রসূতিটির দিকে নজর দেবার সময় পেলেন। জননী শিশুটিকে আঁকড়ে ধরে নির্ভয়ে ঘুমুচ্ছে। অপর একটি

স্ত্রীলোক যে তার ছেলেটিকে কেড়ে নিতে নিঃসারে তার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন, সে বিষয়ে সে পরম নির্বিকার। কয়েক মুহূর্তের জন্য আগন্তুক মহিলাটির হৃদয় এক অপূর্ব স্নেহরসে সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই পৃথিবীতে এই মা ও শিশুটিকে—আলাদা করে রাখা সত্যই এক নিগূঢ় লজ্জা ও অপমানের কথা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বার্থের ওজরে তাঁর সব দুর্বলতা ভেসে গেল। তিনি ভাবলেন, এই মাকে একদিন না একদিন সন্তানকে পরিত্যাগ করতেই হবে, কেননা, ওর জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক অকথিত লজ্জা ও ঘৃণার ইতিহাস। দুঃখের প্রথম প্রদাহ কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি এ ব্যাপারে খুসী হয়ে উঠতে বাধ্য। নিজের অভিশপ্ত সন্তান যে একজন মনের মত নতুন মা পাবে, এটা তার পক্ষে কম খুসীর কথা নয়!

হঠাৎ নিদ্রাভিভূতা যুবতীটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। দু'জন মহিলা পরস্পরের প্রতি কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আগন্তুক মহিলাটি সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

এ দৃশ্যে প্রফেসরও কিছুক্ষণের জন্যে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করে তিনি হাসিমুখে প্রসূতিটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত? বাচ্চাটি ভাল আছে ত?"

মেয়েটি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। শিশুটি ততক্ষণে জেগে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে সুরু করে দিয়েছে। জননী ঝুঁকে পড়ে তাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক সুগভীর লজ্জার অরুণাভা তার গণ্ডে তখন যেন আবির ছড়িয়ে দিয়েছে।

আগন্তুক মহিলাটি ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে যেতে আর একবার আড়চোখে শিশুটিকে দেখে নিলেন। তাঁর মনে হ'ল, তিনি বুঝি আপন সন্তানের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছেন।

দুই

পৃথিবীতে বহু ধরণের ক্লান্তি আছে!

সুখী লোকে ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার এমনও ক্লান্তি আছে, যা থেকে ঘুমিয়েও নিস্তার নেই। দুঃস্বপ্নের মতই সেই ক্লান্তি সর্বদা ঘুমের ঘোর কাটিয়ে দিতে চায়। জানালার পাশের ৪৭ নম্বরের আজ সেই দশা। ঘুমিয়ে পড়ল সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠে সে পুনবায় সুগভীর ক্লান্তিতে তলিয়ে গেল।

অতবড় একটা ঘরে অতগুলি কচি শিশুর চ্যাঁ-ভ্যাঁর মধ্যে ঘুম আসা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। যদি বা তার নিজের সন্তানটি চুপ করে শুয়ে আছে অপর একটি শিশু হয়ত হঠাৎ কেঁদে উঠল। কখনও কখনও আবার একাধিক শিশু জেগে উঠে কান্নার ঐকতান সুরু করে দিলে। এবং যতই সে নিদ্রাল্পতার জন্যে বিরক্ত হতে লাগল, ততই তার শব্দ-সহনশীলতার ক্ষমতা কমে এল। ক্রমশঃ তার মেজাজ গেল বিশ্রী রকম বিগ্‌ড়ে।

এই সাত দিন সে এখানে এসেছে। এর মধ্যে একসঙ্গে আধ ঘণ্টার বেশী সে কখনও ঘুমুতে পারেনি। মাথায় যেন তার নেমে এসেছে পর্বতের ভার। আলোর সামান্যতম রেখাও তখন অসহ্য বোধ হচ্ছে। পিঠের নীচে শক্ত তোষক কাঁটার মত পিঠে বিঁধছে। পিঠ ও শিরদাঁড়া ব্যথায় টনটন করে উঠছে।

সর্বদা বুকের মধ্যে থেকে এক উদ্‌গত অশ্রুর বন্যা ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে। আত্মদমনের সব শক্তিই যেন সে অকস্মাৎ হারিয়ে বসে আছে।

কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে সে উঠে বসল। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পাশের বাড়ীর ছাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখল, বাইরে রোদের তেজ কমে এসেছে। গো-ধূলির ধূসর আকাশের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। দূর-বনানীর ওপারে পাহাড়ের শীর্ষদেশগুলি অস্তগামী সূর্যের আভায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। এই একই জানালা দিয়ে রোজ রোজ একই দৃশ্য দেখে দেখে তার কেমন যেন ক্লান্তি এসেছে। কিন্তু তবুও তার নিকট-প্রতিবেশের তুলনায় দূরের ঐ একঘেঁয়ে দৃশ্য অনেক ভাল।···সহরের ভেতরে একটা গীর্জার গম্বুজ তৈরী হচ্ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হতে লাগল, কেউ যদি ওখান থেকে অসাবধানে পড়ে যায়? মাথাটা তার হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে উঠল।···

এখন সকলেরই দৃষ্টি ঘন ঘন দরজার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের সান্ধ্য-আহারের সময় হয়েছে। সকলের মুখেই প্রত্যাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। আশা করতে কি দোষ যে আজকে তাদের ভাগ্যে কালকের চেয়েও ভাল খাদ্য জুটলেও জুটতে পারে?··· এমন সময় একজন ধাত্রী তার বাহুমূল স্পর্শ করতেই ৪৭ নম্বর চম্‌কে উঠল। ধাত্রীটি তার হাতে ছোট একটা টাকার থলে

গুঁজে দিয়ে নীচুস্বরে বললে, "দশ ক্রোণারের বেশী মোটে পাওয়া গেল না।"

যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, এমনি দৃষ্টিতে ৪৭ নম্বর মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "বলকি ? ঘড়িটা যে সোনার !"

"ওরা বলে ওটা নাকি বেজায় পুরণো আর প্রায় অকেজো।"

৪৭ নম্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে থলেটা বিছানার একপাশে রেখে দিয়ে ধাত্রীটিকে ধন্যবাদ জানালে।

ধাত্রীটি চলে যেতেই সে আবার গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে বিছানার তলায় হাত দিয়ে সে আর একটি ছোট টাকার থলে বার করলে। দেখলে সেখানে রয়েছে মাত্র আট ক্রোণার। তা'হলে দশ আর আট—এই আঠারো ক্রোণার মাত্র তার পুঁজি। এদিকে হাসপাতালের দেনা কোন্‌ না পঁচিশ ক্রোণারে দাঁড়াবে ?

৪৭ নম্বর পুনরায় ভাবনার অগাধ সমুদ্রে ডুবে গেল। এমনি একটানা ভাবনা সে ভাবছে অহোরাত্র—আজ কয়েক দিন ধরে। সত্যিই কি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত বাকী দেনার জন্যে তার নাম-ধামের জন্য জুলুম করবে ? যাক্‌ ওভারকোটটা বেচলে কোন্‌ না দশ ক্রোণার পকেটে আসবে। কোটটা প্রায় নতুনই আছে। এদিকে বসন্তকালও ত এসে গেল ! যদি কোনরকমে এখানকার দেনা মিটিয়ে একবার সে বেরিয়ে পড়তে পারে তা'হলে এর পরে ভাববার সে প্রচুর সময় পাবে।

এই ভেবে সে অনেকটা আশ্বস্ত হ'ল। আব একবাব সে চোখেব পাতা বুজবাব চেষ্টা করলে। নাঃ, ভেবে ভেবে সত্যিই আব পাবা যায় না! এই তেঁতো আব নিবস ভাবনার কি আব শেষ হবে না? দূব হোক্‌গে ছাই, ভেবে আব সে অনর্থক মাথা খাবাপ কববে না। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাব হাতে সে নিজেকে ছেড়ে দেবে।

দু'জন ছাত্রী-ধাত্রী দরজা ঠেলে ঘবে প্রবেশ করল। তাদের দু'জনেব হাতেই খাবাবেব ট্রে। সেই মামুলি পরিজ্‌ আব নীল্‌চে দুধ—যা' চোখে পডামাত্র সবকটি রুগীই বিবক্ত্‌ হয়ে মুখ ঘুবিয়ে নিলে। প্রসূতিদেব খেতে দেওযা হ'ল। তাদেব মধ্যে কেউ কেউ এমন দুবল যে তাদেব চাম্‌চে দিযে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। কেউ কেউ আবার ক্ষিদের জ্বালায় তাড়াতাড়ি ঐ অখাদ্যগুলো গিল্‌তে লাগল।

৪৭ নম্বব ভেবেই চলেছে। এক বৎসব আগে পর্যন্ত সে কি কল্পনা কবতেও পেবেছিল যে একদিন তাকে নর্দমা থেকে তুলে আনা ঐ সব ধাঙবগুলোব সাথে এক সঙ্গে, একছাতেব নীচে বাস করতে হবে?

পডন্ত বোদের কিছুটা সোনালী আভা জানালা বেয়ে টেব্‌চা হয়ে ঘবের এক অংশে পড়েছে। ঘবেব বাকী অংশটুকু ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। বিছানায় শায়িত মূর্তিগুলিকে এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

কোণের দিকে একটি বছর আঠারোর মেয়ে অনবরত 'খাব' 'খাব' করে চীৎকার করছিল। সে ক্রমাগতই বলে চলেছে, "এক ক্রোণারের বিনিময়ে কেউ কি আমাকে তার খাবারের অংশ বেচবে না?"—তার সোনালি রঙের ফাঁপানো চুলের ওপব পড়ন্ত রোদের লালিমা পড়ায় তাকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

ছাত্রী-ধাত্রী একজন প্রসূতিকে খাওয়াবার জ.ন্য খুব খোসামুদি করছিল। স্ত্রীলোকটি অঝোর-নয়নে কেঁদেই চলেছে। কিছুই খাবে না সে।' ওটি একটি নিরাশ্রয়া ভিখারিণী। গতকাল তার সন্তানটি খারাপ রোগে মারা গেছে। তবুও সে তার মৃতপুত্রের জন্যে, আহার-জল ত্যাগ করে কেঁদেই খুন হচ্ছে, কোন প্রবোধই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না।

অপরদিকের কোণের দিক থেকে সেই মেয়েটি আবার চীৎকার করে' উঠল, "আমাকে আর একটু পরিজ্‌ দাও না! কি দরকার ওটাকে সেধে—দাওনা ওর খাবারটা, আমি খেয়ে ফেলি। ক্ষিদেয় যে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

প্লেটের ও চামচের ঠুন্‌ঠুনিতে স্থানটি মুহূর্তেই সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই খাবারের নিন্দেতে যেন পঞ্চমুখ। একজন কৃষক-কন্যা চাম্‌চে দিয়ে দুধ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিদ্রোহের বাষ্পে ফেটে পড়ল যেন!—"রাম কহ, এর নাম কি দুধ?" চামচে দিয়ে কয়েক ফোঁটা দুধ সে মেঝেতে ছিটিয়ে দিলে।

নার্স কোমরে হাত দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "বলি তোমাদের

ব্যবহারটা কি শুনি? ওরকম অসভ্যতা করলে প্রফেসরকে রিপোর্ট করে দেব—তখন বুঝবে মজাটি!"

"যাও, যাও, ভারী আমার প্রফেসর-রে? নিয়ে এস না তাকে এখানে। সেই বিট্‌লে মিন্‌ষেকেই জিজ্ঞাসা করব, এখানকার গরুগুলো কি দুধের বদলে জল দেয়?"

একজন মুখরা স্ত্রীলোক এতক্ষণে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে বললে, "আহাঃ, কি ভাল ব্যবহারই না পাচ্ছি এখানে? আমরা ত পথের আবর্জনা! আর আমাদেব সন্তানরা যদি মরেই যায়, তা'হলেই বা কার কি এলো-গেল? কিন্তু ওদিককার সৌখীন ওয়ার্ডে দেখে এস গিয়ে, মেমসাহেবরা সব সিল্কের চটক্‌দার পোষাক পড়ে শুয়ে আছেন। আমাদের দুধের ননী আর মাখন দিয়ে তাদের পেটের গর্ত বোজানো হচ্ছে। আমরা কচি খুকী আর কি! কিছু বুঝিনা, না? এ পৃথিবীতে বড়লোকের পা চাট্‌তেই ত গরীবের জন্ম।

চারিদিক থেকে সমর্থনসূচক ধ্বনি উঠল। বাড়্‌তি একটুখানি পরিজের জন্য যে মেয়েটি এতক্ষণ মাথা খুঁড়ছিল, এইবারে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "খাবার কথা আর বল কেন? ঐ অনামুখো প্রফেসরটিই কি কম! এদিকে আমাদের সঙ্গে কুকুরের অধম ব্যবহার করেন, আর ওদিকে দেখ গিয়ে, বড়লোকদের বিবি দেখলেই হাঁটু গেড়ে বসে, হাতে চুমু খাবার সে কি ধূম! ওদের সব ভাল-ভাল খাবার খাওয়ান হচ্ছে। আমাদেরই বেলায় যত বিট্‌লেমি।"

অপর একটি মেয়ে রসিয়ে বললে, "যেন বড়লোকের বিবিদের ছেলে-পিলে ভিন্ন পথে হয়!"

এই কথাই হাসির একটা রোল উঠল। সেই ঐকতান হাসির কলরোল ছাপিয়ে বিকৃত-মস্তিষ্কা, ছন্নছাড়া মেয়েটির চাপা কান্না থেকে থেকে ঘরের মধ্যে পাক্‌ খেতে লাগল।

এইবার শিশুদের ঢালাও নৈশ-শয্যার পালা। দু'জন ধাত্রী কোনরকমে তাদের ধোয়া-মোছা সেরে পোষাক বদ্‌লে দেবার তোড়জোড় করছে। অপর একজন ধাত্রী একগোছা অপরিষ্কার ও ভেজা জামা নিয়ে এসে হাজির। ষ্টোভের আগুনে সেগুলোকে একটু নিম-শুকোন গোছের করে নিয়ে ছেলেদের পোষাক বদলাতে বসে গেল। পোষাকের ছিরি-ছাঁদ দেখে মায়েরা ত খড়্গ-হস্ত। ধাত্রী দু'জন অদৃশ্য কোন একজন ধাত্রীব ঘাড়ে সবটুকু দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "মরি, মরি, কাজেব কি ছিরি গো! ওসব সহুরে বিবিদের মোমের হাত। জলে আঙুল চোবান না, পাছে সোনার অঙ্গে কালির ছাপ লাগে।"

এই মোক্ষম ব্যাখ্যায় প্রসূতিদের মন ভিজ্‌লো না। তারা একযোগে গালাগালি, রাগারাগি ও নানা দৈহিক আক্ষেপ-বিক্ষেপ সহযোগে গায়ের ঝাল মেটাতে লাগল। ৪৭ নম্বরের এসব গোলযোগ একেবারেই ভাল লাগছে না। সে অগত্যা কানে হাত দিয়ে, কাত্‌ হয়ে শুয়ে রইল। না, এখানকার এই কচ্‌কচি সত্যিই অসহনীয়।

অবশেষে গালাগালির দম্‌কা বাতাস একসময় আপনা হতেই থেমে এল। খর রসনা শান্ত হল। যদি মেনে নেওয়া যায় যে শিশুদের প্রাথমিক চরিত্র-গঠন মাতৃস্তন্যেই সঞ্চারিত হয়, তা'হলে এ কথা ধ্রুব সত্য যে এখানকার নবজাতকেরা সব অবশ্যই উত্তরকালে স্বনামধন্য 'অ্যানার্কিষ্ট' হয়ে দাঁড়াবে।

৪৭ নম্বরের শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। শিশুটির গায়ে একখানা আল্‌তো হাত রেখে সে বাইরের ধূসর সান্ধ্য-আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে ছিল। এতক্ষণে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছে, ঘরের ছাদ পর্যন্ত ক্রমশঃ অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে আসছে। এইবার এই সান্ধ্য অন্ধকারে প্রসূতিদের গল্পের আসর বসবে—কতো রকমের অদ্ভুত আজগুবি সব গল্প! সবই প্রত্যক্ষদর্শিনীর আপন অভিজ্ঞতার কথা, এবং সবই এই হাসপাতালের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে। মারাত্মক রকমের রোমহর্ষক আখ্যায়িকাগুলি এইবার ক্রমান্বয়ে আখ্যাত হতে থাকবে। ৪৭ নম্বরের এসব আর ভাল লাগে না। কাঁহাতক আর রোজ রোজ একই খোঁয়ারী ভাল লাগে!

সে বিরক্ত হয়ে, ঘুমের ভাণ করে, মট্‌কা মেরে পড়ে রইল।

তিন

নাঃ, ঘুম আর আসে না! রাজ্যের চিন্তা উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এসে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে। ৪৭ নম্বর বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। অন্যান্য বিছানা থেকে দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কারুর কারুর তা রীতিমত নাকই ডাকছে। কখনও কখনও কোন একটি শিশু জেগে উঠে ভীষণ কান্না জুড়ে দিচ্ছে। বাইরের পৃথিবী যেন অদ্ভুত স্তব্ধ।

যখন অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন চিন্তার শক্তি যেন অপরাজেয় হয়ে ওঠে। রাতের পর রাত একই চিন্তার ভীষণতা মানুষের টুঁটি চেপে ধবে। অন্ধকারে রাজ্যের বিভীষিকা ভীতিময় রূপ ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

এখন অবশ্য আবর্জনা স্তূপে শুয়ে আছে সে, কিন্তু চিরদিনই তার এরকম দিন ছিল না। সেও একদিন কোন এক রৌদ্রোজ্জ্বল সোনালী ভূখণ্ডে পরিভ্রমণ করে বেড়াত। তার এখনকার পৃথিবী কল্পনাতীত ভাবে পৃথক।...এখনও যেন সে সেই স্বর্গোদ্যানটিকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। কত শত পরিচিত মুখ তার সামনে দিয়ে ছায়াছবির মত ভেসে যাচ্ছে। তাদের সকলকেই সে অপরিসীম ঘৃণা করে।...৪৭ নম্বর পাশের প্রসূতির ঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখলে, দুটো বেজেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে, ওঃ, আজকের এই কালরাত্রি কি আর পোহাবে না?

আবার সে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শত চেষ্টাতেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলে না।··· সে চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে মাঝ-সমুদ্রে একটি আনন্দোজ্জ্বল দ্বীপখণ্ডকে। তার মধ্যে একটি ছোট্ট কুটীর। সমুদ্রের আলো-ঘরের রক্ষকের বাসস্থান সেটা। এখনও তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা সেই কুটীরে বাস করছেন। তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানেন না তার এই বিপদের কথা।—সে পাশ ফিরে শুয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।···আবার ছায়া ছবি ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। চৌদ্দ বছরের একটি বালিকা সেই সুন্দর দ্বীপে ধীবর কন্যাদের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রগর্জন যেন সে এখান থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কখনও কখনও সেই ক্ষুদ্র বালিকাটি চলেছে তার মা'র সঙ্গে খানা-ডোবা পার হয়ে, পাহাড়-বেষ্টিত সর্পিল পথটি ধরে, ছোট্ট গীর্জার দিকে।

—সে আর তার দু' ভাই বাবার কাছে পড়া বুঝিয়ে নিচ্ছে। বাবা ও মা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী মানুষ। মা কড়া ধর্মপরায়ণা মহিলা, আর বাবা পাঁড় মাতাল। কর্তৃপক্ষের অবিচারে বাবার চাক্‌রী গিয়েছিল, তাই বৃদ্ধ বয়সের শোক ভুলতে তিনি মদ ধরেছিলেন। অহোরাত্র নির্জলা মদে চুর্‌ হয়ে থাকতেন।

তার ছোট ভাই দু'টি কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গেল। বড়টির জালিয়াতীর অপরাধে হ'ল জেল, আর ছোটটি একজন সার্কাসওয়ালীর প্রেমে পড়ে দেশান্তরী হ'ল। মা এইসব দুর্বিপাককে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভেবে চুপ করে সয়ে গেলেন। আর

দুর্ভাবনায় ও মনোকষ্টে বাবার সব ক'গাছি চুলই গেল পেকে। কিন্তু সে সঙ্কল্প করলে যে করে হোক বাপ-মায়ের মুখে সে পুনরায় হাসি ফিরিয়ে আনবে। সেইভাবে সে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল।

যখন তার বয়স বাইশের ওপর হয়ে গেছে, তখনও সে তার আরব্ধ কর্ম করে চলেছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, নিবাসক্ত ভাবে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে। তাদের এই বিবশ জীবনে কোন আত্মীয়ই তাদের দগ্ধ-ভাগ্যেব সঙ্গদান করতে এগিয়ে এলেন না। এই শ্বাসরোধকারী একাকীত্বেব মধ্যে তাব দিনগুলি মন্থবগতিতে গড়িয়ে চলল।

এমন সময় তার দূর সম্পর্কের এক কাকীমাব কাছ থেকে এল একখানা চিঠি। কাকীমার অবস্থা ভালই। মোজেন্‌ অঞ্চলে অগাধ সম্পত্তি ও জমিদারীর মালিক। তিনি তাকে কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাবা শুনে ঠোঁটে পাইপ চেপে বললেন, "তাহলে ওরা এখনও আমাদেব ভোলেনি দেখছি।"

কয়েকদিনের জন্যে এই খাঁচার জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি—মন্দ কি! অনেক ভেবেচিন্তে বাবা মত দিলেন। মাত্র গত বসন্তের কথা এ সব! অথচ কতদিনের কথা বলেই না মনে হয়। উত্তেজনায় ৪৭ নম্বর বিছানায় উঠে বসল। দু'হাতে মুখ ঢেকে অস্ফুটস্বরে কেঁদে উঠল, 'ভগবান! ঘুম কি আজ আর আসবে না?'

আবার তার অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ভেসে উঠল এক

জমিদারের বাড়ীর ছবি। লেকের ধারে গাছ-পালা বেষ্টিত মস্ত একটা বাড়ী। লেকের শান্ত জলে অট্টালিকার ছায়া পড়েছে। জুন মাসে বাগানের আপেল গাছগুলিতে থরে থরে মুকুল ধরেছে। মাঠের সবুজ ঘাসগুলি নিদাঘের শান্ত বাতাসে শিরশির করে কাঁপছে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তার ছোটঘরের বারান্দাটিতে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস সারা অঙ্গে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। লেকের মাথায় উঠেছে একাদশীর একখণ্ড চাঁদ।

কি এক অজ্ঞাত কারণে প্রথমাবধিই কাকীমাকে বা খুড়তুতো বোনেদের তার ভাল লাগেনি। তাব বাপ ভাইদের নিয়ে তাঁরা অযথা কৌতুক করতেন। ঐ তার একটি দুর্বল স্থান যেখানে আঘাত কবলে সে সইতে পারে না। সে বুঝতে পারল তাঁরা সবাই তাকে করুণা করছেন। দৃষ্টি দিয়ে, ইঙ্গিত করে এবং বাক্যযন্ত্রণার সাহায্যে তাঁরা সর্বদা তার দুবল স্থানে আঘাত করতে চেষ্টা করছেন। এমনকি তার পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়েও ব্যঙ্গ করতে তাঁরা কসুর করতেন না।

এ'সব অপমান তাকে নীরবে সইতে হ'ত, কারণ এত শীঘ্র বাড়ী ফিরে যেতে তার মন চাইছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ তার রাগ হ'তে লাগল। বিন্দু বিন্দু ক'রে মনে ঘৃণা জমতে লাগল। কিন্তু তা' সে প্রকাশ করল না। এইভাবে বাধ্য হয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে শিখলে। বানিয়ে বানিয়ে সে বাড়ীতে খুসী-ভরা চিঠি লিখে পাঠাতে লাগল।

কাকীমার বহু আত্মীয়-স্বজন তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে দু' একজন তার প্রতি একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা দেখাতে লাগলেন। একজন ধনী চাষী ত তাকে বিবাহ-প্রস্তাবই ক'রে বসলেন। তাবপরে একদিন একজন পশুচিকিৎসকও পূর্বোক্ত মহাজনের পথে পা বাড়ালেন। বলা-বাহুল্য সে ঘৃণাব সঙ্গেই এঁদের উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। সে তখন রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে সুরু কবেছে—শুধু তার বাপ মাকে খুসী করবার জন্যই নয়, সে চায় তার বোনেদের ওপর টেক্কা দিতে, তাদের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে।

অবশেষে এল সে,—তার কাকীমার মৃতস্বামীর কি সূত্রে যেন আত্মীয় হয়। সবে মাত্র ডাক্তারী পাশ করেছে এবং অবস্থাও অদ্যভক্ষধনুর্গুণঃ নয়। সে লক্ষ্য কবছে যুবকটি তার একজন বোনের প্রতি. যেন একটু বেশী মাত্রায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। অতএব সেও তক্কে তক্কে রইল কি করে বাতাসটা নিজের পালে টেনে আনা যায়।

যুবকটি নিজে যেন একটি সজীব প্রাণ-চঞ্চলতা—বাড়ীটাতে সে প্রাণপ্রাচুর্য ফিরিয়ে আনলে। আজ পর্বত-আরোহণ, কাল জঙ্গলে চড়ুইভাতি। হাসি, আনন্দ ও উচ্ছ্বলতা যেন লেগেই রইল। সেই আনন্দ-প্রবাহে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। আর তার বোনেদের হিংসা করবার প্রয়োজন নেই। এখন আর প্রতিহিংসা নয়, এখন শুধু আনন্দ আর বিজয়োৎসব।

বনে বনে চলল তাদের গোপন অভিসারের পালা।

সপ্তাহগুলি যেন আনন্দের হিল্লোলে ছুটে পালাতে লাগল। সে কল্পনা করতে সুরু করলে, তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা যেন কন্যার আনন্দ-স্নেহচ্ছায়ায় এসে পরিণত বয়সের শ্রান্তি অপনোদন করছেন।

তারপর হঠাৎ একদিন সে চলে গেল। বিদায় মুহূর্তে তাকে কোন কথা জানাবার অবসর হ'ল না। মন তার অস্বস্তিতে ভরে উঠল। প্রত্যহ সে আশা করতে লাগল, এইবার বুঝি তার নামে একখানা পত্র আসছে। কিন্তু কোন পত্রই এল না। তখন বাধ্য হয়ে নিজেই সে একখানা পত্র লিখলে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু সে পত্রের জবাব এল না।

তারপর একদিন অতর্কিতভাবে সে এক নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে বাধ্য হ'ল। খাবার টেবিলে এ-কথায় সে-কথায় শুনলো, যুবকটীর ক্রিষ্টিয়ানা সহরের একটি মেয়ের সঙ্গে বাক্‌দান হয়ে গেছে—শীঘ্রই বিয়ে হবে। ওঃ সেদিনের সেই নির্মম মুহূর্তগুলির কথা সে কোনদিনই ভুলবে না।

সেই দুর্মুখ রাত্রির কথা তার মানসপটে ভেসে উঠল। মাঠে মাঠে সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেমন্তের ছোট দিনের বেলা ফুরিয়ে এল। ধরণীর বুকে আস্তে আস্তে নেমে এল ধূসর সন্ধ্যা। ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে সে ছুটে চলেছে উদ্‌ভ্রান্তের মত। এমন সময় তার মনে সেই ভীষণ চিন্তা উদিত হ'ল। যদি সত্যিই তাই হয়? যদি সত্যিই সে দুর্ভাগ্য নেমে আসে তার জীবনে?…

আস্তে আস্তে ভোরের আলো জেগে উঠল পৃথিবীর বুকে। সে তখন ঘরে ফিরে এল। সারাটা দিন সে অস্বাভাবিকভাবে কাটিয়ে দিল। পূর্বের মত হাসল, গান গাইল। পাছে অপরে তার অবস্থার কথা জানতে পাবে এই ভয়ে সে খুসীর ভাণ করে হেসে-খেলে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে সে টের পেল যে তার সর্বনাশ হয়েছে, সে সন্তানের মা হতে চলেছে। যখন তার কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেবার কথা তখন অবস্থাবিপাকে তাকে হেসে উঠতে হ'ল। না, কোনমতেই ব্যাপারটিকে সে লোক জানা-জানি হতে দেবে না। এ বিপদ থেকে যেমন করেই হোক তাকে উদ্ধার পেতেই হবে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে? বাড়ীতে? না, তার বৃদ্ধ বাপ-মায়ের ভাঙ্গা কাঁধে এ কলঙ্কের বোঝা আর সে চাপাতে পারবে না। তাঁদের প্রায় অবনমিত মাথাকে সে আরও নুইয়ে দিতে পারবে না মাটির ধূলোতে!

একদিন বাড়ীতে সে এক উচ্ছ্বাস-ভরা চিঠি লিখে জানালে যে সে স্কুলে ভর্তি হতে চায়, বাবা যেন কিছু টাকা অবিলম্বে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিনের মধ্যেই টাকা এসে পৌছল। তারপর একদিন সে খামকা কাকীমার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে তাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

আহত পশুর মত গর্জাতে গর্জাতে সে সহরের বুকে আত্ম-গোপন করলে। একমাসের জন্যে একটা ইস্কুলেও ভর্তি হ'ল। কিন্তু অধিকদিন স্কুলে যেতে আর তার সাহস হ'ল না। সে

ঘরের কোণায় নিজেকে বন্দী করে রাখল। ওঃ, সে শীতকাল যেন আর কাটতে চায় না!

তারপর একদিন সন্ধ্যায় কোনগতিকে সে প্রসূতিসদনে এসে উপস্থিত হ'ল। এক অব্যক্ত বেদনায় তার সারা অঙ্গ তখন আকুঞ্চিত হচ্ছে। ডাক্তার খাতায় লেখার জন্যে তার নাম ধাম জানতে চাইলেন, কিন্তু একগুঁয়ের মত সে চুপ করেই রইল।

কিছুক্ষণ পরে তাকে জোর করে নাওয়ান-ধোওয়ান হ'ল এবং একটা ময়লা ও দুর্গন্ধময় বিছানায় ধরে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। ইতিপূর্বে সে কল্পনাও করতে পারেনি যে মানুষের জীবন এত নির্জন ও নিরানন্দ হ'তে পারে।

আরও দুর্ভোগ তার কপালে লেখা ছিল। রাজ্যের ডাক্তার ও ছাত্র জড়ো হয়ে তাকে পরীক্ষা করতে সুরু করে দিলে। প্রথমে তার মনে হ'ল সে বুঝি লজ্জায় মরেই যাবে। সে প্রতিবাদ কবতে ছাত্রেরা শ্লেষভরে বললে, তারা নাকি ওখানে শিখতেই এসেছে—মজা করতে নয়।

দীর্ঘ পনের ঘণ্টা ধবে সে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা। 'মা' 'মা' বলে সে চীৎকার করতে লাগল। সন্ধ্যার দিকে দু'জন ছাত্র রাত্রেব ডিউটি দিতে হাজির হ'ল। জ্ঞানার্জনের জন্যে তারাও তাকে পরীক্ষা করতে সুরু করে দিল। তারা আরও দু'জন ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে এল। তারপর পঙ্গপালের মত স্ত্রী-পুরুষ একে একে এসে জড়ো হতে লাগল। সে যেন আর রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ নয়। সে যেন একটা জড়পদার্থ,

একটা কৌতূহলের সামগ্রী। সকলেই তাকে নেড়ে-ঘেঁটে তাদের শিক্ষার ভিত্‌কে পাকা করে নিতে চায়। এদিকে তার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হচ্ছে সে দিকে কারও দৃষ্টি নেই। সে বিনা প্রতিবাদে অনড় হয়ে পড়ে রইল। উঃ! কি নিষ্ঠুর, কি সাংঘাতিক সে অবস্থা—কল্পনা করতে আজও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

রাত্রের মধ্যে আরও দুজন প্রসূতিকে ভর্তি করা হ'ল। তাদের চীৎকারে কাণ পাতা দায়। প্রতিটি প্রসূতির মাঝখানে একটা করে পাত্‌লা কাপড়ের পর্দার ব্যবধান মাত্র। রাত্রের দিকে সহকারী সার্জেন এলেন। তিনিও তাকে যথাবিধি পরীক্ষা কবলেন। তিনি আবার ছাত্রদের ডেকে এনে, তাকে উপলক্ষ্য করে বিশেষ ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা সুরু করে দিলেন। একটা কি যন্ত্র দেখিয়ে বললেন, "এটা প্রয়োগ করা দরকার।" যন্ত্রটি নিয়ে তিনি কাজ সুরু করে দিলেন। ছাত্ররা হাঁ করে সব কিছু দেখতে লাগল। তারপর! তারপর!!—তারপরের কথা আর কিছু মনে নেই তার।

জ্ঞান হ'লে সে সাশ্চর্যে লক্ষ্য করলে যে সে তখনও জীবিত আছে। হঠাৎ হাসপাতালের অন্যান্য সব শব্দ ও প্রসূতিদের কলরব ছাপিয়ে একটি তীক্ষ্ণ শিশুকণ্ঠের কান্না তার কাণে এল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হ'ল, পরীরা যেন তাকে স্বর্গে বহন করে নিয়ে চলেছে। এক স্বর্গীয় পুলকে তার সমস্ত অন্তরাত্মা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

যে মেয়ে ছাত্রটি তাকে পরিচর্যা করছিল, সে এগিয়ে এসে জানালো যে তার একটা সুন্দর খোকা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট বাচ্ছাটিকে যখন ধুইয়ে মুছিয়ে তার কোলে দেওয়া হ'ল তখন আনন্দাশ্রুতে তার বুক ভেসে যাচ্ছে।

তারপর যতই দিন যেতে লাগল ততই এই নিদ্রাহীন রাত্রি, বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ ও অতীতের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে তার নবজাগ্রত মাতৃত্বের সুষমা নিঙরে নিতে লাগল। বিছানা হয়ে দাঁড়াল অঙ্গার শয্যা।

চিন্তার আবর্তে সে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলে। দিবাগমের সঙ্কেতরূপে সহরের বুকের ওপর যখন আস্তে আস্তে হল্‌দে একফালি আলো ছড়িয়ে পড়ল তখন গভীর হতাশায় ভেঙ্গে প'ড়ে সে কেঁদে উঠল, "আর একটি রাতও যদি এমনি বিনিদ্র কাটাতে হয়, তাহলে নির্ঘাৎ আমি পাগল হয়ে যাব।"

চার

ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রফেসর ওয়ার্ড দেখতে বেড়িয়েছেন। ৪৭ নম্বরের দিকে সহাস্যমুখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়েছিল ত?"

৪৭ নম্বর মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বললে, "ধন্যবাদ, তা' একরকম হয়েছিল বইকি!" সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলে, প্রফেসর আজ কেমন যেন সদয় হয়ে উঠেছেন তার ওপর।

প্রফেসব তার কব্জি ধরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ী পরীক্ষা কবলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "কই, তা' ত মনে হচ্ছে না!" মেট্রণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঐ দিককার ঐ একবিছানা-ওয়ালা ফাঁকা ঘরটায় একে বদলি করে দাও।" এই বলে তিনি সস্নেহ-সুপ্রভাত জানিয়ে, অন্যান্য রুগী দেখতে বেড়িয়ে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পবে তাকে যখন সবাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে তখন ওয়ার্ডময় একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। সে যখন বিদায় নিচ্ছে তখন বিস্ময়ে ও ঈর্ষায় অন্যান্য রুগীদের কলজে ফেটে যাবার উপক্রম! তারা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে, হঠাৎ মেয়েটিব প্রতি ভালবাসার এত ধূম পড়ে গেল কেন!

দক্ষিণ-খোলা একটা ঘরে তার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, খাটের ওপর ধব্‌ধবে বিছানা পাতা, এমনকি গায়ে দেবার লাল কম্বলগুলি পর্যন্ত যেন পরিচ্ছন্ন।

বিছানায় শুয়ে তার বেশ আরাম বোধ হ'ল। ঘরের এক কোণে বাচ্ছাটির জন্যে একটা দোলনা রয়েছে দেখে তার মনটা খুসীতে ভরে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল এক কাপ গরম চকোলেট। সে ভেবে উঠতে পারল না, এ সবের কি অর্থ! ভাবনা হ'ল, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে না ত!

দুপুরের খাবার সময় প্রফেসর আবার এলেন। প্রফেসরের প্রতি তার মন যেন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। সে হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে। অধ্যাপক বিছানার ধারে বসে পড়ে স্নেহভরে তার হাত দু'খানি তুলে নিয়ে বললেন, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। এখনি অবশ্য উত্তর চাই না, ভেবে-চিন্তে কাল জবাব দিও।" খানিকটা চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, "তোমার সঠিক পরিচয় জানি না, কিন্তু বয়েস হয়েছে, অভিজ্ঞতাও কিছু কম হয়নি সুতরাং কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারি। হয়ত তোমার বিয়েও হয়েছে, তোমাকে দেখে বেশ ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিম্বা এও হ'তে পারে যে এখনও তুমি অবিবাহিতা। তোমার বিয়ে হয়েছে, কি হয়নি, তা' জানতে চাই না। কিন্তু তোমার ছেলেটি যদি একটি ছোট-খাট রাজত্ব পায়, আশা করি তোমার তা'তে খুব আপত্তি হবে না। অর্থাৎ আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, ধর, তোমার ছেলেকে যদি কোন সহৃদয়, বিত্তশালী, নিঃসন্তান দম্পতী নিজের ছেলের মত মানুষ করতে চান, তোমার কি খুব আপত্তি হবে তাতে?"

প্রফেসর একদৃষ্টে তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। এ কথা শুনে মেয়েটি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, অধ্যাপক যেন তার সঙ্গে রসিকতাই করছেন।

অধ্যাপক পুনর্বার বললেন, "হয়ত এই ব্যবস্থা তোমার মনঃপুতই হবে। তা'ছাড়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যদি তোমার কিছু অর্থের প্রয়োজন থাকে তাও পাবে তুমি। আমি যাদের কথা বলছি তাঁরা মস্ত বড় ধনী। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার ছেলে রাজার হালেই থাকবে সেখানে।"

না, নিশ্চয়ই তিনি ঠাট্টা করছেন না। মেয়েটির দু'চোখ জলে ভরে এল। কতদিন সে স্নেহের মুখ দেখেনি। কতদিন পরে অযাচিত ভাবে সে স্নেহস্পর্শ পেলে। এ কি ভগবানের আশীর্বাদ নয়! হু হু করে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

অধ্যাপক তার চুলে স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "অমন ভেঙ্গে পড়োনা, ভালো করে চিন্তা করে দেখ। আমার মনে হয় এতে তোমার মঙ্গলই হবে। ভেবে-চিন্তে কাল এর জবাব দিও।" এই কথা বলে অধ্যাপক বিদায় নিলেন।

আলো জ্বেলে দিতেই মানুষ বুঝতে পারে এতক্ষণ কতখানি অন্ধকারের মধ্যে সে ডুবে ছিল। যখনই কোন অযাচিত করুণা আশীর্বাদের মত নেমে আসে, মানুষ তখনই নিজের নিঃস্বতার কথা বেশী করে উপলব্ধি করে। কাল পর্যন্ত যে ভবিষ্যতের

চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখছি। এবং কি করে হাসপাতালের দেনা শোধ করবে ঠিক পাচ্ছিল না, সে কিনা আজ—! না, নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখছে। সে চোখ মুছে মনে মনে বললে, বৃথা কেঁদে মর কেন? এ স্বপ্ন ছাড়া আর কি?

স্বপ্নের ঘোর কাটতে না কাটতে একজন ধাত্রী এসে জিজ্ঞাসা করল আহারের পর সে ক্লারেট্‌ খাবে, না বিয়ার খাবে। যে সৌখীন প্রসূতিদের নিয়ে কাল পর্যন্ত তারা ঠাট্টা-মশকরা করেছে সে কিনা আজ তাদেরই একজন হতে চলেছে? এ কথা চিন্তা করতেও তার হাসি পেল।

তারপর আহারের পালা। তার জন্যে সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু ও মুখ মোছবার জন্যে ফরসা ধপধপে তোয়ালে এল। বহুদিন পরে সে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেল। তার মনের আকাশ যেন হঠাৎ রৌদ্রকিরণে ঝলমল করে উঠল। সেই প্রদীপ্ত আলোকশিখার ছোঁয়া লেগে সে যেন যুগপৎ হাসি ও কান্নার আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ল। যখন মানুষ অধিক দিন আলো-বাতাসহীন অন্ধকূপে পচে মরে তখন একটি মাত্র শীর্ণ দীপশিখাই তার চোখ ঝলসে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

সারা দুপুর ধরে সে অধ্যাপকের প্রস্তাবের কথা চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারলো না, এতে ভাববার তার আছেই বা কি। সে যখন নর্দমায় শুয়ে কাতরাচ্ছে তখন একজন সহৃদয় ব্যক্তি যেন তাকে সাহায্য করতে স্নেহ-হস্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে 'না' বলবে সে কেমন করে?

পরের দিন অধ্যাপক যখন এলেন তখন একটি মাত্র অনুবোধের কথাই তার মনে এল—তাঁরা যেন তাব পরিচয় জানবার জন্যে জিদ্‌ না কবেন। অধ্যাপক গোঁপে তা দিয়ে, ঘাড় নেড়ে বললেন, "সে জন্যে তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।" অধ্যাপক এমন ভাবে কথাটা উড়িয়ে দিলেন যেন অমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান আব সময়েব অপব্যবহার করা- একই কথা। মেয়েটির মনে হ'ল, তাব বুকে কে যেন একটা ছোট্ট ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। যেমন করে হোক তাকে উঠ্‌তে হবে—বাঁচতে হবে। সুতবাং এ প্রস্তাবে সে প্রসন্ন মনেই রাজী হ'য়ে গেল।

প্রফেসর উঠে পড়ে বললেন, "কাল কিন্তু তাবা এসে ক্ষুদে যুবরাজকে নিয়ে যাবেন। তোমাকে কিছু অর্থও দিয়ে যাবেন সেই সঙ্গে।"

অধ্যাপক চলে যেতে ৪৭ নম্বব শুয়ে পড়ল। 'অর্থ', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি ভাল ভাল কথাগুলো তখনও তাব মাথাব ভেতর ঘুরছিল। সে নিশ্চিন্ত হ'ল। ভাবলে, এ পৃথিবীতে ভগবান তাহলে সত্যিই আছেন! আনন্দের প্রথম শিহরণ কেটে যেতে এতক্ষণে তার মনে পড়ল, এইবাব শিশুটিকে কিছুক্ষণ আদর করা দবকার। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র অবশিষ্ট আছে। সে শিশুটিকে নিজের কাছে আনিয়ে কোলে ক'বে তাকে ঘুম পাড়াল। তারপর একদৃষ্টে তার ঘুমন্ত মুখেব দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে! দেখতে দেখতে তার স্বপ্ন

মাতৃত্ব হঠাৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তার মন স্নিগ্ধ মাতৃরসে নিসিক্ত হয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রুধারা নেমে এল। তার ক্ষুদ্র নির্দোষ শিশুটি যে অতঃপর সমস্ত অভিশাপ লঙ্ঘন ক'রে নির্বিরোধ জীবন যাপন করতে চলেছে, এ কথা চিন্তা করে তার চোখের জল আর বাধা মানতে চাইল না।

ক্রমে বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। এবার তাঁরা ছেলেটিকে নিয়ে যাবেন। শিশুটিকে হাসপাতালের পোষাক খুলে দিয়ে সুন্দর ফুলকাটা পোষাক পড়ান হয়েছে। শেষবারের মত তাকে একবার মায়ের কোলে দেওয়া হয়েছে। মা শিশুটিকে কোলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছে, ময়লা জামা পড়া গরীব ছেলেটি তার হঠাৎ কেমন বড়মানুষী পোষাক পড়ে রাজপুত্র সেজে বসেছে। এই পোষাকগুলি হয়ত তার নতুন মায়ের নিজের হাতে সেলাই করা পোষাক।

সে হেসে ছেলেকে বিদায় দিল। তার ছোট্ট গাল দুটি অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, "খোকা, সোনা আমার, আর হয়ত আমাদের দেখা হবে না। নতুন বাপ-মায়ের কাছে লক্ষ্মীটি হয়ে থেক, বাপ্‌ আমার!

ছেলেটিকে নিয়ে যাবার পর সে বহুক্ষণ ধরে নিঃসারে মরার মত পড়ে রইল। তারপর অকস্মাৎ মুখ পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অধ্যাপক যেন অন্তরালে বসে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিলেন। এতক্ষণে তিনি ঘরে ঢুকে একগোছা নোট মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আমি

তোমাকে, বিশেষ করে তোমার ছেলেকে তার এই সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।" তারপর তিনি যে সব ছেলেরা এই হাসপাতালে জন্মেছে তাদের ভাগ্যহত ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনেক সহানুভূতির কথা বললেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "নিজের কথা ভেবেছ কিছু? এখান থেকে ছাড়া পাবার পর কি করবে স্থির করেছ?"

সজল চক্ষু মার্জনা করে মেয়েটি উত্তর দিলে, "এখনও তেমন কিছু ঠিক করিনি।"

"ধর, যদি কোন ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তোমার জন্যে? যেমন ধর, একজন ধনী নরউইজিয়ান বিপত্নীকের বাড়ীতে যদি তোমাকে 'হাউস-কিপারের' কাজ দেওয়া হয়, নেবে কি?"

মেয়েটি ভাবলে, এখন বেশ কিছুদিন বাড়ীর নাম মুখে আনা চলবে না। অতএব অধ্যাপকের এই প্রস্তাবটিতে সে যেন কৃতজ্ঞ বোধ করলে। ভাবলে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সত্যিই খুব দয়ালু। অধ্যাপকও মেয়েটির কপালে দু' একটি স্নেহের টোকা দিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

কয়েক দিন পর। সন্ধ্যার অন্ধকারে হাসপাতালের উঠানে একখানা গাড়ী এসে দাড়াল। একজন শীর্ণ, পাণ্ডুর স্ত্রীলোক সেই গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসল। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুক্ষ বাগানে-ঘেরা সেই গেট-ওয়ালা বাড়ীটার দিকে

সে শেষবারের মত একবার তাকিয়ে দেখলে। তার মনে হতে লাগল, কত দীর্ঘ দিনই না সে সেখানে কাটিয়ে গেল।... এখন মেয়েদের খাবার দেবার সময় হয়েছে। সেই একঘেঁয়ে পরিজ আর নীল্‌চে দুধ। এখানকার সেই সব দুর্ভাগা স্ত্রীলোকদের কি সে কোন দিন ভুলতে পারবে এ জীবনে ?

সশব্দ রাস্তাঘাট অতিক্রম ক'রে সে চলেছে। এখন তার গন্তব্যস্থল সেই মেয়েটির বাড়ী--যেখানে সে সর্বশেষ আশ্রয় নিয়েছিল। আজকের রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে।

সে রাত্রে সে তার ক্ষুদ্র অপরিসর ঘরটিতে বসে মা'কে চিঠি লিখতে বসল। লিখলে যে তার স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে। স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে সে সুইডেনে একজন ধনী, নিঃসন্তান বৃদ্ধের বাড়ীতে হাউস-কিপারের চাকরী পেয়েছে। মা-বাবা যেন তার জন্যে দুঃখ না করেন। চাকরিটি সম্মানজনক বলেই সে তা' গ্রহণ করেছে। সর্বশেষে সে লিখলে, তার মাইনের টাকা থেকে সে কিছু অগ্রিম পেয়েছে-- তাই থেকে যৎসামান্য কিছু মাকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিচ্ছে। তিনি যেন গ্রহণ করেন। চিঠিখানা শেষ করে সে ভাবতে বসল, এই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ভূমিকা তার জীবনে কোনদিন শেষ হবে কি ?

বহুদিন পর সে-রাত্রে সে প্রাণভরে ঘুমিয়ে বাঁচল।

পাঁচ

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মেয়েটি একদিন ট্রেণে চেপে বসল।

স্মালেনীন প্রদেশের ভেতর দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে সোজা দক্ষিণমুখো। গোলাবাড়ী আর তুষার-ঝরা লাল্‌চে মাঠের গা-বেয়ে, আবার কখনও বা ছোট ছোট ফার্ গাছে ঘেরা সমতলভূমির ওপর দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে।

গত কয়েকদিন তার কেটেছে জিনিষপত্র কেনা-কাটায় আর বাঁধা-ছাঁদায়। যাক্ চেহারাটা যে চলনসই করতে পেরেছে এতেই সে খুসী। এ ক'দিনে প্রফেসরের নির্দেশ মত মল্ট-মিল্ক, স্টাউট আর টাট্‌কা দুধ খেয়ে তার শরীরের বেশ উপকার হ'য়েছে। এখন নিজেকে বেশ শক্ত-সামর্থ্য বলে মনে হচ্ছে।

এতদিন পরে সে এই সহর ছেড়ে চল্‌লো। কতদিন তার মনে হয়েছে এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল তাকে! কত না ঝড় এ ক'দিনে বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। ইদানিং আবার হাসপাতালের বিভীষিকা দুঃস্বপ্নের মত চেপে ধরেছিল তাকে। ...এখন সে চলেছে দূরে, বহু দূরে—যেখানে গিয়ে সে দুশ্চিন্তা ও নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে বলেই তার বিশ্বাস।

তার মনে হতে লাগল, সে যেন এতদিন পরে সত্যিই নিশ্চিত অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে পা দিয়েছে। মনে সে এক আনন্দ-শিহরণ অনুভব করছে। দুশ্চিন্তার ছেঁড়া জাল মাঝে

মধ্যে যে তাকে উদ্বিগ্ন না করছিল, তা' নয়, কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা আজকাল অনেকাংশে কমে এসেছে।...গত একমাস যাবৎ সে পিতা-মাতার কাছ থেকে কোন চিঠি-পত্র পায় নি। সে মনকে এই বলে প্রবোধ দিল যে সেটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র - তা'তে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এখন থেকে সে অতীতকে বিস্মৃত হয়ে খুসী হয়ে উঠতে চায়। সে যেন প্রায় জাহাজডুবি হ'তে হতে বেঁচে গেছে। এখনও সে যদি খুসী হয়ে উঠতে না পারে, ত খুসী আর হবে কবে ?

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে দেখলে, ভিজে ঘাস ও গাছ-পালার ওপরে সূর্যকিরণ পিছলে পড়ছে। যে কোন আলোক সঙ্কেত দেখলেই আজকাল যেন তার ছেলের কথা মনে পড়ে যায় !

মধ্যরাতে ট্রেণ তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছল। ছোট্ট একটি সহর। সহরের সমস্ত আলোকমালা তখন নির্বাপিত হয়েছে। চাঁদের আলোয় ধারে-কাছের ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ীগুলিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। যে ঘোড়ার গাড়ীটি তাকে নিতে স্টেশনে এসেছিল সেটিতে সে সমস্ত মালপত্র সমেত চড়ে বসল।

একটি ঘন বনে ঘেরা উপত্যকাভূমি দিয়ে গাড়ী আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। পাশে বয়ে চলেছে শব্দময় ছোট একটি গ্রাম্য নদী। তুষারাচ্ছাদিত রাস্তার ওপর দিয়ে চলার জন্যে গাড়ীর চাকা থেকে এক ধরণের ঘর্ঘর শব্দ উঠছে। বেগবান অশ্বের খুরের আঘাতে রাস্তার জমে-ওঠা বরফ চারিদিকে রেণু রেণু

হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পব গাড়ী একটা বাগান-ঘেবা বড় অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল।

দবজায় গাড়ী দাঁড়াতেই গৃহস্বামী হের ফ্ল্যাটেন তার হাত ধরে নামালেন। ডিনাব প্রস্তুত ছিল; গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে গিয়ে ডাইনিং রুমে বসালেন। পথে কোনবকম কষ্ট হয়েছিল কিনা ইত্যাদি মামুলি প্রশ্নের পর বললেন, "ভাল কথা, আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আপনার নাম জানতে পাবিনি।"

এ কথা শুনে যুবতীটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে সঙ্কুচিতভাবে উত্তর দিলে, "আমার নাম রেগিণা—রেগিণা অ্যাজ্‌।"

বহুদিন পরে এই প্রথম সে তার নাম নিজের মুখে উচ্চারণ করল। তাব নিজেরই কাণে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল নামটা। কিন্তু হের্‌ ফ্ল্যাটেন অতঃপব ক্রিষ্টিয়ানার অন্যান্য খববা-খবর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

হের ফ্ল্যাটেনের বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। বিশাল সুগঠিত দেহ, মাথাভরা টাক এবং খড়্গনাসার নীচে একজোড়া পুরু, কটা গোঁপ। সবশুদ্ধ লোকটিকে প্রথম দর্শনেই বেশ শান্ত ও সহৃদয় বলেই ধারণা জন্মে। তিনি গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল হ্যামারে। যখন তিনি কুড়ি বছরের যুবক তখন স্পেনের একটা অফিসে কেরাণীব চাকরী নিয়ে ঢুকে পড়েন। ভাগ্য তাঁর বরাবর সুপ্রসন্নই ছিল। মাত্র গত বৎসর কাঠের কারবারের জন্যে এই জঙ্গল সমেত বিশাল জমিদারীটা কিনেছেন।

কিন্তু গত বৎসর স্ত্রী মারা যা।ার পর থেকে তাঁর আর বিষয়-কর্মে মন নেই—স্থির করেছেন সব বেচে দিয়ে নরওয়েতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করবেন।

রেগিণা ভুলে গেল যে এখনও পর্যন্ত ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার ভাল করে পরিচয়ই হয়নি—এমন কি তাঁকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বললেই হয়! তাঁর সহজ সরল ব্যবহারে রেগিণার সমস্ত সংকোচ একমুহূর্তে দূরীভূত হ'ল। ভদ্রলোকটি যে তাকে আপ্যায়নও করলেন না আবার অবজ্ঞাও দেখালেন না—এতে রেগিণা খুব খুসীই হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ফ্লাটন যা জিজ্ঞাসা করে বসলেন তার জন্য রেগিণা মোটেই প্রস্তুত ছিল না, প্রশ্ন শুনে সে চম্‌কে উঠল।

হের ফ্লাটেন কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "বারসেলোনায় আজ্‌ নামে নৌ-বাহিনীর একজন লেফটেনান্ট-এর সঙ্গে একবার আলাপ হ'য়েছিল। একটি নরউইজিয়ান যুদ্ধজাহাজে তখন তিনি কর্মরত ছিলেন। আপনি কি তাঁর কোন আত্মীয়া হন?" এই কথা বলে তিনি রেগিণার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

সেই মুহূর্তে রেগিণার মনে হ'ল পৃথিবী যেন দুলছে। মিথ্যা-ভাষণের যে অভ্যাস এতদিন ধরে সে রপ্ত করেছিল, এবারও সে সেটাকে কাজে লাগালো। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক গলায় সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, আমার বাবা ক্ষেত-খামারের কাজ করতেন।"

পাইপে তামাক ঠাস্‌তে ঠাস্‌তে ভদ্রলোক বললেন, "বটেই ত! বটেই ত! আমারই ভুল। ও রকম বোকার মত প্রশ্ন করাই উচিত হয়নি আমার। কালই ত নরউইজিয়ান একটি খবরের কাগজে দেখলাম যে অ্যাজ্‌ নামে সেই ভদ্রলোকটি সমুদ্র উপকূলের কোথায় যেন আলো-ঘরের রক্ষক ছিলেন— হঠাৎ মারা গেছেন। আপনি যদি তাঁর মেয়ে-টেয়ে কেউ হতেন, তা'হলে কি আর আজ আপনাকে এখানে দেখতে পেতাম?"

রেগিণা পড়ে যাচ্ছিল; কোন রকমে টেবিল ধরে সামলে নিল। সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল যাতে সে সংজ্ঞা না হারায়!

হের্‌ ফ্ল্যাটেন অত সব লক্ষ্য না ক'রে বললেন, "আজকে এই পর্যন্তই। আপনি নিশ্চয়ই পথশ্রমে ক্লান্ত বোধ করছেন। এখন আপনার শুয়ে পড়া উচিত। পরিচারিকা আপনাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দেবে।"

এই কথা বলে হের্‌ ফ্ল্যাটেন শুভরাত্রি জানিয়ে খাবার ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

ছয়

ভূগর্ভ খনিতে কাজ করে যে শ্রমিক তার কাছে পৃথিবীর আলোকরেখাকে যেন এক সঞ্জীবনীশক্তির আধার বলে মনে হয়। অন্ধকার পাতাল থেকে সে যখন ক্রমশঃ ওপারের দিকে উঠতে থাকে তখন তার মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হ'তে থাকে। যতই খনির তিমির-অন্ধকার দূরে গিয়ে ধরণীর আলো নিকটবর্তী হয় ততই সে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সে সমতলভূমিতে উঠে এসে সেখানকার স্বাধীন মুক্ত মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে যায় তখনই সে সাশ্চর্যে লক্ষ্য করে যে সকলেই যেন তাকে ভূগর্ভের শ্রমিক বলে ঘৃণা করে দূরে সরে যাচ্ছে। যতই সে ধুয়ে মুছে ফিট-ফাট হো'ক না কেন, পাতালের কাদামাটি যেন অদৃশ্যভাবে তার সব অঙ্গে লেপটে থাকে।..

রেগিণারও আজ সেই অবস্থা।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে রেগিণার মনে হ'ল আর শুয়ে থাকলে বোধ হয় সকলের কাছে সে ধরা পড়ে যাবে। শুধু যে এখনি নীচে যাওয়া দরকার তাই নয়, তাকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন তার কিছুই হয়নি। এই চিন্তা করে যতই সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, ততই এক নিরুদ্দম জড়তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

যতদিন তার সমস্যাগুলি জটিল ছিল, ততদিন তা' থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তার মন আকুলি-বিকুলি করত। এখন

আবার সে পায়ের নীচে শক্ত মাটির ছোঁয়া পেয়েছে কিন্তু তবুও তার মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে কই? ভবিষ্যৎ তার কাছে আগের মতই ঝাপসা বোধ হচ্ছে কেন? এখন ত সে তার পিতার অন্ত্যেষ্টিতে গিয়ে যোগ দিতে পারে এবং তার ভাগ্যহীনা মায়ের কাছে গিয়ে বরাবর বাস করতে পারে। কিন্তু তা' তার কাছে অসম্ভব বলে বোধ হচ্ছে কেন? সে বুঝতে পারছে না কেন সে এখনও ভীরুর মত আত্মগোপন করে থাকবে! এখন আর কেন সে আগের মত সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে না! অন্ধকার উপত্যকাভূমি পার হ'য়ে এই ত সে সূর্যকিরণ-উদ্ভাসিত পর্বত-শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে। তবে, তবে, তবে?...

রেগিণার ধারণা ছিল, নতুন পরিবেশে গিয়ে হয়ত সে পুনরায় সুখের মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু এখন দেখলে, তার ভাগ্যে সুখের স্থান নেই। আবার পূর্বের মতই তাকে সাবধানে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে তার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হয়ে না পড়ে! সে ভেবে দেখলে তার মায়েরও অনন্ত দুঃখের জীবন! এই দুঃসহ জীবনযাত্রাই কি সে কামনা করেছিল?

রেগিণা নীচে নামবার জন্য সংক্ষেপে প্রস্তুত হয়ে নিল। আয়নার সামনে শেষবারের মত দাঁড়িয়ে দেখলে, প্রসাধন সত্ত্বেও তার মুখখানাকে কেমন ভিজে-ভিজে, ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডাজলে তোয়ালে ভিজিয়ে সে বেশ করে আরক্ত চোখে-মুখে ঘসে নিলে। দেখলে, এবার তাকে অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

রেগিণা নীচে নেমে এসে দেখলে, হের্ ফ্ল্যাটেন ইতিমধ্যেই অফিসে বেড়িয়ে গেছেন। ঝকঝকে রান্না ঘরটিতে দু'জন পরিচারিকা কাজ করছিল। যে মেয়েটি এতদিন হাউস-কিপারের কাজ চালাচ্ছিল সেই মেয়েটিই প্রাতরাশের পর রেগিণাকে সমস্ত ঘর-দোর-গৃহস্থালী দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল।

দ্বিপ্রহরে ফ্ল্যাটেনের সঙ্গে খেতে বসে রেগিণা নীরবে নতমুখে আহার সমাপ্ত করে ঘুমুবার অছিলায় পাশের একটা ছোট কামরাতে গিয়ে ঢুকল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, বৃক্ষসঙ্কুল উপত্যকাটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। দূরের ফ্যাক্টরীর উঁচু চিম্‌নী থেকে ক্ষীণ একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। সেইদিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেগিণার কেমন যেন ধারণা হ'ল, তার বাবা যেন সমস্ত কলঙ্কের কথা জানতে পেরে মনোকষ্টে ও ভগ্ন-হৃদয়ে মারা গেছেন। সন্তানদের উপর্যুপরি দুর্ব্যবহার কত আর সহ্য হয় মানুষের?

যতই দিন যেতে লাগল ততই রেগিণার ভয় হ'তে লাগল, এবার বুঝি তার প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। অপরিচিত লোকগুলোর চোখে যেন সন্দেহের ছায়া দুলছে, মুহূর্তের অসাবধানতায় সব কথাই বুঝি প্রকাশ হ'য়ে পড়বে! সুতরাং সে হেসে-খেলে, চাকর-বাকরদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করে, ফ্ল্যাটেনের সম্মুখে প্রফুল্লতার ভাণ করে সাবধানে দিন কাটাতে লাগল।

প্রতি সন্ধ্যায় কর্মক্লান্ত ফ্ল্যাটেন বাড়ী ফিরে এসে আহারাদির পর বই ও পাইপ নিয়ে তাঁর মৃত পত্নীর ছোট পড়ার ঘরটিতে

গিয়ে ঢোকেন। রেগিণা লক্ষ্য করলে, তাঁর সমস্ত সত্তা যেন তাঁর প্রেমময়ী পত্নীর ধ্যানে মগ্ন। স্ত্রীর ঐ ছোট্ট, শান্ত, গৃহ-কোণটি যেন তাঁর কাছে একটি শুচি-শুভ্র মন্দির বিশেষ!

ক্বচিৎ-কদাচিৎ ফ্ল্যাটেন তাঁর দু'একজন বন্ধুবান্ধবকে ডিনারে নেমতন্ন করেন। কাঠ, বন আর বিদেশী বাজার দর নিয়ে তাঁদের আলোচনা চলে।···সময় সময় ফ্ল্যাটেনকে কর্ম-ব্যপদেশে সহরের বাইরে যেতে হ'য়। রেগিণা কৃতজ্ঞচিত্তে লক্ষ্য করলে, ফ্ল্যাটেন আর ভুলেও কোন দিন তার বাড়ী-ঘর বা আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করেন না। তাঁর গৃহস্থালীর তদ্বির তল্লাশের ভার সম্পূর্ণভাবে রেগিণার হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এমনি নিরুপদ্রবে দিনগুলি কেটে যেতে লাগল।

একদিন খাবার টেবিলে ফ্ল্যাটেন হঠাৎ রেগিণাকে প্রশ্ন করে বসলেন, "অ্যাজ্‌, জায়গাটা কি তোমার ভাল লাগছে না? আমি লক্ষ্য করছি, দিনের পর দিন তুমি কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছ। কাল কয়েক জায়গায় আমার যাবার কথা আছে—চল না আমার সঙ্গে। এই সূত্রে অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে'খন।"

রেগিণা নানারকম কাজের ওজর দেখিয়ে প্রস্তাবটা এড়িয়ে গেল। বললে, শরীর তার বেশ ভালই আছে...। কিন্তু বলেই বুঝল, কথাটা কেমন যেন বে-খাপ্পা, নিরস জবাবদিহির

মতই শোনাচ্ছে। ক্ল্যাটেন যে বার বার তার দিকে চেয়ে দেখছেন, সেটা অনুভব করে রোগিণার ভয় হ'ল। ভাবলে তিনি হয়ত তীক্ষ্ণ-সন্ধানী দৃষ্টিতে তার জীবনের প্রকৃত রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করেই ফেলবেন।

একদিন রেগিণা তার মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। পেয়েই বুঝল এর পূর্বেও তিনি একখানা পত্র দিয়ে-ছিলেন কিন্তু সেখানা তার হস্তগত হয়নি। পিতার শেষকৃত্যে বাড়ী যায়নি বলে মা খুব দুঃখ করে পত্র লিখেছেন। অবশ্য তিনি যে কিছু সন্দেহ করেছেন, চিঠি পড়ে তা' মনে হয় না। সুতরাং পিতাও যে মৃত্যুর পূর্বে কিছু জেনে যাননি, রেগিণা এ বিষয়ে একপ্রকার নিঃসন্দেহ হ'ল।

সেই বৃহৎ অট্টালিকার তিন-তলার একখানা ঘর রেগিণাব জন্যে নির্দিষ্ট হ'য়েছে। বসন্তের হাল্‌কা সন্ধ্যায় রেগিণা নিজেব ঘরে দোলানে চেয়ারটিতে চুপটি করে বসেছিল। দূরে ফার-গাছে ঘেরা উঁচু-নীচু পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে। সবশেষেব উঁচু পাহাড়টি সান্ধ্য আকাশেব রক্তিমাভায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ফ্যাক্টরীর শব্দ থেমে গেছে, কেবল চিম্‌নিগুলো থেকে নির্গত অল্প-সল্প ধোঁয়া দূর শূন্যে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই নিথর সান্ধ্য-স্তব্ধতার মধ্যে নদীর কুলু-কুলু ধ্বনিটুকু সুললিত সঙ্গীতের মূর্ছনার মতই রেগিণার কানে ভেসে এল।

রেগিণা কেমন এক ধরণের ভাবালুতায় ডুবে গেল যেন। তার মনে হ'তে লাগল যে তরুণ চিত্ত জয় করার দিন তার চলে

গেছে। নিজেকে কারও বধূরূপে কল্পনা করার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। যৌবনের স্বপ্ন দেখার দিন তার জীবনে আর বোধ হয় ফিরে আসবে না।

এইভাবে দিন গড়িয়ে চলল। রেগিণা সর্বদা সযত্নে হাসি-খুসীর মুখোস পড়ে চলা-ফেরা করতে লাগল। কিন্তু যার গোপন ব্যথার স্থান আছে, তার সর্বদা ভয় পাছে মর্মস্থানে কেউ আঘাত করে বসে। রেগিণারও তেমনি সর্বদা মনে হতে লাগল হের ফ্ল্যাটেন বোধ হয় তার সব কথাই জেনে ফেলেছেন।

মাঝে-মধ্যে রেগিণা ভাবে, সেই খাম্‌খেয়ালী অধ্যাপকটি কেনই বা তার প্রতি এত দরদী হয়ে উঠলেন এবং কেনই বা বেছে বেছে তারই ওপর অযাচিত অনুগ্রহ বর্ষণ করতে লাগলেন। তবে কি তাঁর কোন আত্মীয়ের অদৃশ্য ইঙ্গিত ছিল এর ভেতর? এমনও হতে পারে যে তার অলক্ষ্যে পর্দার অন্তরালে যে অভিনয় অভিনীত হচ্ছিল ঘুণাক্ষরেও সে তা' টের পায়নি। এমনও তো হতে পারে যে তার নিজেরই কোন আত্মীয় ছেলেটিকে দত্তক নিয়েছেন, তাই সমস্ত ব্যাপারটা অমন চুপিসারে সারা হ'য়েছে। এইরূপ নানা অবাস্তব ও উদ্ভট চিন্তা রেগিণার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। নিদ্রায়, জাগরণে ও সর্বকর্মে এই জটিল চিন্তা-সূত্র নিকট-বান্ধবের মত তার সঙ্গ ছাড়তে চাইল না।

ক্রমশঃ রেগিণার মনে হ'তে লাগল, এই যে এতদিন ধরে

এতগুলি লোক তাকে নানাভাবে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে, এটা তার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। দয়া প্রদর্শনের সে উপযুক্তই নয়। তার মত একজন আত্ম-বিস্মৃত, ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের পক্ষে সমস্ত কিছু অপমান হাসিমুখে সহ্য করা উচিত। যদি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। তা'হলে সত্যিই কি দুজ্ঞে'য় নিয়তি অদৃশ্য হস্তে তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে? তার নিজের ইচ্ছাশক্তির কি কোন মূল্য, কোন ক্ষমতাই নেই? নতুবা তারই বা এমন পোড়া-কপাল হবে কেন?

তারপর ক্রমশঃ বসন্তকাল এগিয়ে এল। জানালার ফোঁকরে ফোঁকরে চড়ুই পাখীদের বাসা বাঁধবার সাড়া পড়ে গেল। নদীর দু'পাশের পথের ধারে ধারে নানাবর্ণের পুষ্পগুলি কার্পেট বোনা সুরু করে দিলে। সূর্যের খরতাপ দিন দিন বেড়েই চলল। রেগিণা সমস্ত চিন্তা মন থেকে ঝেরে ফেলে দিয়ে পুনরায় খুসী হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তার ফলন্ত যৌবন যেন শাসনের ভ্রূকুটি জোর করে তাড়িয়ে দিতে চায় যেমন করে অটুট স্বাস্থ্য রোগ-তাপকে অক্লেশে নির্বাসিত করে রাখে।

বসন্ত চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এগিয়ে এল। এখন অবসর-সময়ে রেগিণা বাগানের কাজ করে। ঘাস ও ঝরা-পাতার আমেজে বাতাস যেন ভারী হয়ে এল। ফলের গাছগুলি এখন মুকুলের ভারে অবনত হয়ে এসেছে। এই নির্জন প্রকৃতির কল্যাণে রেগিণা ভুলে যেতে বসল সে কোথায় আছে, কেন

আছে ! তার মনে হ'তে লাগল, এই ক্ষুদ্র রাজত্বটি যেন তার নিজেরই। সে ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে গাছ-পালা নীল-আকাশ দেখে দেখে আর পাখীর কূজন শুনে শুনে তার অবসর বিনোদন করতে লাগল। এই নিষ্ঠুর, কর্কশ পৃথিবী যেন তার সমস্ত কিছু কদর্য অভিজ্ঞতা সমেত ক্রমশঃ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

একদিন রবিবার দিনাবশেষে রেগিণা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর ফ্ল্যাটেন দু'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রেগিণা ফ্ল্যাটেনকে লক্ষ্য করেনি। সে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাগানে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফ্ল্যাটেন ভাবলেন, মেয়েটি সত্যিই অনুপমা সুন্দরী। কয়েক দিন ধরেই তিনি লক্ষ্য করছেন, স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল রেগিণার দেহশ্রী যেন দিন দিন ফেটে পড়ছে।

অতঃপর ফ্ল্যাটেন প্রত্যহ খাবার টেবিলে অনাবশ্যক ভাবে দেরী করতে লাগলেন। রেগিণাকে দেখলেই তাঁর শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের দাবদাহ যেন জুড়িয়ে যেত। সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের মর্মবেদনা যেন ভুলে যেতেন !

একদিন তিনি স্নেহস্বরে ডাকলেন, "ফ্রকেন অ্যাজ্‌..."

রেগিণা চম্‌কে মুখ তুলে তাকাল। ফ্ল্যাটেন যে সেদিন এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছেন, তা' সে জানতেও পারেনি। রেগিণা এমন করে চম্‌কে উঠল যে মনে হ'ল

বুঝি সে কোন অপরাধমূলক কাজ করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। সে উদ্বিগ্ন, নত মুখে ধীরে ধীরে ফ্ল্যাটেনের কাছে এসে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বললে "আমাকে কি কিছু বলছিলেন ?"

ফ্ল্যাটেন বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ তার নাম ধরে ডেকেছিলেন। সুতরাং সেই অসাবধান মুহূর্তে হঠাৎ কি বলা উচিত, না উচিত, স্থির করতে না পেরে আমতা আমতা করতে লাগলেন।

সূর্যের আভায় রেগিণার মুখমণ্ডল রক্তকমলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। ইদানিং আবার ঈষৎ কৃশ দেহতনু স্বাস্থ্য-সম্পদে অপরূপ শ্রী-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সবুজ গাছ-পালার পটভূমিতে, হালকা রঙের ঢিলে-ঢালা পোষাক পরে পটে আঁকা ছবিটির মতই সে সন্তর্পণে ফ্ল্যাটেনের কাছে এসে তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই বিশেষ মুহূর্তে রেগিণাকে ভারী ভাল লাগল তাঁর। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে তিনি বললেন, "ফ্রকেন্‌ অ্যাজ্‌, এখানে একটানা আর বোধ হয় তোমার ভাল লাগছে না। কালই আমি কয়েক-দিনের জন্যে গুটেনবার্গ যাচ্ছি। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, চলনা আমার সঙ্গে! আমারও একজন সঙ্গী হবে আর খোলা বাতাসে তোমারও মনটা প্রফুল্ল হবে। যাবে কি ?"

মাটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেগিণা সলজ্জভাবে উত্তর দিলে, "বেশ ত! চলুন না।"

বড় সহরের পথের ওপর দিয়ে যেতে যেতে রেগিণার ভয় হ'তে লাগল, হঠাৎ যদি পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! চিন্তাটাকে সে মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারল না। এই ভয়-ব্যাকুলতা ছায়াব মতই তাব সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল।

বাড়ী ফিরে এসে বেগিণা উপলব্ধি করলে, এবাবকাব যা না তার কাছে মোটেই উপভোগ্য হয় নি। স্বাভাবিক ভাবে আনন্দ উপভোগ করবার ক্ষমতাই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। দুঃখের বিভীষিকাই যেন তার নিত্যসঙ্গী ; পৃথিবীর যেখানেই সে পালিয়ে যাক্‌না কেন, তারা তাব সঙ্গ কিছুতেই ছাড়বে না।

তা'হলে নিত্য শত শত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আনন্দেব ভাণ করে থেকে কি লাভ ? এই মুখোসটাকে ছিঁড়ে ফেললেই বা কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ? কিন্তু এই চিন্তামাত্রই বেগিণা চম্‌কে উঠল ; উচ্ছ্বাসে তার সারা মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করলে, না, যেমন করেই হোক, তাকে এই অবস্থা সহ্য করতেই হবে। মা যেন ঘুণাক্ষবেও এ'কথা টেব না পান! কি হবে আর তাঁব যন্ত্রণা বাড়িয়ে ? নিজের সম্বন্ধে অবশ্য তাব আর ভয় নেই। যে অপমান তাকে অহরহ পর্যুদস্ত করছে, তার বেশী আব কি-ই বা হবে তার ?

রেগিণার প্রতি ফ্ল্যাটেনের ব্যবহার দিন দিন যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে রেগিণা মাঝে-মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্থ হ'য়ে উঠত। তাঁর স্নেহের অত্যাচার যেন দিন দিন

বাড়াবাড়িতে দাঁড়াচ্ছে। যখনই তিনি দূরদেশ থেকে ফিরতেন, তখনই তিনি রেগিণার জন্যে কিছু-না-কিছু দামী উপহার কিনে আনতেন। তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন তার প্রতি, যেন সে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী।

রেগিণা চম্‌কে উঠে উপলব্ধি করলে, এইবার বুঝি আরম্ভ হ'ল! এইবার হয়ত একদিন রাত্রে তিনি পা টিপে টিপে গোপনে তার শয়নগৃহে গিয়ে হাজির হবেন। সব পুরুষই সমান কিনা! হয়ত প্রথম থেকেই এই চক্রান্তটি ঠিক ছিল। রেগিণা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ফ্ল্যাটেন আর যদি এক পাও অগ্রসর হন, তা'হলে ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে তাঁর মাথাটি গুঁড়িয়ে দেবে।

একটা প্রশস্ত ঘরে, ফ্রু ফ্ল্যাটেনের একটি বড় সজ্জিত তৈলচিত্র দেয়ালে ঝোলান ছিল। ফ্ল্যাটেন সেই চিত্রটির দিকে প্রায়ই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হত, তিনি যেন তাঁর বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। সেই ছবির ঠিক নীচে রাখা সোফাটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে তিনি যেন তাঁর অবলুপ্তা প্রিয়াকে অনুরোধ করতেন, যাতে করে তিনি এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেন। সেই বৃদ্ধ, আপনভোলা বিপত্নীকটি এইভাবে প্রত্যহ নিজের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করে ক্ষত-বিক্ষত হ'তে লাগলেন।

সাত

রেগিণার মনে হ'ল তার যেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হ'য়েছে। কি প্রয়োজন তার এখানে বসে শ্রদ্ধা কুড়োবার, যখন তার মনের কথা বুঝবার মত একটা লোকও কাছে নেই ?

খেলোয়াড় যে দৃষ্টিতে দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই দৃষ্টিতে রেগিণা একবার তার নিজের অন্তরটাকে দেখে নেবার চেষ্টা করলে। এ পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে এখন থেকে তাব খুব সাবধানে পা ফেলা উচিত। হের্ ফ্ল্যাটেনকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া দবকাব হয়েছে এবার। তাতে অবশ্য তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হবেন কিন্তু এতে করে তাঁর চোখে তার নিজের সম্মান বেড়ে যাবে বই কমবে না।

এ পৃথিবীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক আছেন যাঁদের আত্মীয় ভাগ্য ভালই। তাঁরা সহৃদয় বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, সৎ এবং উচ্চ শিক্ষাও পেয়ে থাকেন। সময়মত একদিন তাঁরা মনের মত স্বামীও পান। তারপর যখন তাঁরা পুত্রবতী হ'ন, তখন সংসার আনন্দে ভরে ওঠে। সম্মানের জন্যে, অর্থের জন্যে তাঁদের সন্তানকে বিক্রি করে দিতে হয় না। তাঁরাই জানেন দাবা কি করে খেলতে হয়। ভগবানই হয়ত তাদের হয়ে বঁড়ের চাল চেলে দেন।

কিন্তু কেউ কেউ আবার খেলায় মারাত্মক রকম ভুল করে বসে—যার ফলে তাদের গোটা জীবনটাই ছন্নছাড়া ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। রেগিণা এখন মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, তাঁর জীবনে কিভাবে খেলাটা তার আরম্ভ করা উচিত ছিল। সর্বদা মনে হ'তে লাগল, যদি এটা না হ'ত, যদি ওটা না হত! এই 'যদির' গোলকধাঁধায় পড়ে সে দিশেহারা হয়ে গেল।

অতঃপর রেগিণা তার অভাগীনি জননীর কথা স্মরণ করে প্রত্যহ সান্ধ্য-উপাসনায় যোগ দিতে লাগল। প্রার্থনা করতে করতে তার মনে হ'তে লাগল, মা বুঝি খুব কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রত্যেক রবিবার সে চার্চে যেতে আরম্ভ করলে। চার্চের ঐক্য-সঙ্গীত আর অর্গানের সুরঝঙ্কারে তার মন যেন সুদূর অতীতে চলে যেত। সমস্ত শোক-তাপ সে নিমেষে ভুলে যেত। অকপটে ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণই যে আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠতম পথ—সে বিষয়ে তার স্থির বিশ্বাস জন্মাল।

প্রতি রবিবারই স্থানীয় চিকিৎসক একজন বৃদ্ধার হাত ধরে চার্চে আসতেন। বৃদ্ধাকে দেখে রেগিণার মনে হ'ত তিনি নিশ্চয়ই ডাক্তারের মা নন; কেননা, তাঁকে দেখে একজন সাধারণ কৃষক-রমণী বলেই বোধ হ'ত। কিন্তু তিনি ও ডাক্তার সর্বদাই একসঙ্গে চার্চে আসতেন এবং পাশাপাশি বসে একই বই থেকে ধর্মসঙ্গীত আবৃত্তি করতেন।

একদিন খাবার টেবিলে রেগিণা জিজ্ঞাসা করে বসল,

"ডাক্তারেব দয়া-দাক্ষিণ্যেব ত খুবই সুখ্যাতি শুনি। বৃদ্ধাটি কি তাঁরই কোন আশ্রিতা ?"

ফ্ল্যাটেন মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিলেন, "ওটি ডাক্তাবেব মা। বৃদ্ধা অবশ্য বিবাহিতা নন, অতি কঠোব পবিশ্রমে তিনি নিজেব ছেলেটিকে মানুষ কবে তুলেছেন। এতদিনে তাঁর সমস্ত কষ্ট সার্থক হয়েছে।"

বেগিণা হক্‌চকিয়ে গিয়ে বললে, "বলেন কি ?"

"হ্যাঁ, ডাক্তাবটি সর্বত্রই বৃদ্ধাকে সঙ্গে কবে নিয়ে যান এবং সকলকেই গর্বভরে নিজের মা বলে পরিচয় দেন। তাঁদেব উভয়েব সম্পর্কটা তিনি কখনই গোপন করতে চেষ্টা কবেন না। বেচারী বৃদ্ধা যতই অন্তবালবর্তিনী হ'তে চান, ডাক্তার ততই তাঁকে পাঁচজনের সামনে টেনে নিয়ে আসেন। ডাক্তাব এতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না।"

রেগিণাব হঠাৎ নিজের হতভাগ্য ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। সে খেতে ভুলে গিয়ে কেমন যেন আন্‌মনা দৃষ্টিতে সম্মুখপানে চেয়ে রইল। ফ্ল্যাটেনের দিকে আড়চোখে চেয়ে চিন্তা করতে লাগল তাঁর কথাগুলির মধ্যে কোন অলক্ষ্য ইঙ্গিত আছে কি না। হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল এমনি ভাবে অকস্মাৎ রেগিণা জিজ্ঞাসা কবে বসল, "আচ্ছা, লোকেরা তাঁদের নিয়ে কিছু বলা-বলি করে না ?"

"লোকেরা কি বলে, না বলে, ডাক্তারেব সে বিষয়ে ভ্রূ-ক্ষেপ মাত্র নেই।"

উত্তর শুনে রেগিণা হো-হো করে হেসে উঠল।

পরের রবিবার থেকে রেগিণা চার্চে গিয়ে ডাক্তার ও তাঁর মার ঠিক পেছনের জায়গাটিতে বসত। এঁদের কথা চিন্তা করতে করতে সে প্রায়ই ধর্মসঙ্গীত গাইতে ভুলে যেত। বৃদ্ধাটির প্রতি তার সত্যিকারের শ্রদ্ধা হতে লাগল। তিনি যে শুধু এই পৃথিবীর সমস্ত দণ্ড ও অভিশাপকে শিরোধার্য করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও সাহস দিয়ে তাঁর নিজের সন্তানকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আজ এই মুহূর্তে তিনি তাঁর মহান গৌরবের পাশে গর্বভরে বসে আছেন।

কিন্তু সে নিজে? সে অর্থের বিনিময়ে নিজের সন্তানকে বেচে দিয়েছে। রেগিণা চিন্তা করতে চেষ্টা করলে, সে অবস্থায় তার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল কি না।

এইরূপ নানা অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা রেগিণার অপগত হাস্যোজ্জ্বল জীবনধারার মধ্যে এক সর্বনাশা জাল বুনে চলল। অবশেষে একদিন সে কিছু টাকা হাসপাতালের অধ্যাপকটির নামে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলে, টাকাটা যেন তিনি সেই অজ্ঞাত দম্পতীটির কাছে পাঠিয়ে দেন।...তবুও তার মন থেকে গ্লানির ও আত্মধিক্কারের জের কাটল না। ঘৃণিত কার্যের দ্বারা যে হস্ত সে স্বেচ্ছায় মসিলিপ্ত করেছে, এখন শত প্রক্ষালনেও সেই অঙ্গারচিহ্ন হাত থেকে মেটাতে চাইল না। তারপর থেকে সে চার্চে যাওয়াই ছেড়ে দিলে। মাতা-পুত্রের সেই পরম রমণীয় দৃশ্যটি তার বৃশ্চিক-দংশনের মতই অসহনীয় বোধ হ'তে

লাগল। রেগিণার বিশেষ কোন বান্ধবী ছিল না সুতরাং অবসর-বিনোদনের কোন সহজ পথ সে খুঁজে পেল না। কাঁহাতক আর দিনের পর দিন একই কাজে লিপ্ত থেকে সময় কাটানো যায়? কত আর মুখে মুখোস এঁটে মনের প্রকৃত ক্ষতস্থানটিকে গোপন করে বাঁচা চলে? রেগিণার প্রাত্যহিক জীবনে সেই একটা প্রধান সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল।

এখন থেকে প্রায়ই সে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করত, তার ছেলেটি কোথায় এবং কেমন অবস্থায় আছে। এখন প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত জানালার ধারের সেই দোলানে চেয়ারটি অনবরত দোলে। পশ্চিমদিকের নীল-পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রেগিণা আপন মনে কি যেন ভাবে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যেন দেখতে পায়, তার শিশুটি অনিমেষ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এতদিন রেগিণার ভবিষ্যৎ যেন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল কিন্তু এতদিনে হঠাৎ সে যেন একটি ক্ষীণ আলোকরেখা দেখতে পাচ্ছে। ক্ষীণ শিখাটি যেন ক্রমশঃ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই বিকীর্ণ প্রোজ্জ্বল আলোকশিখা ঘিরে নানা সুখস্বপ্ন রেগিণার মনে উদিত হতে লাগল।

আট

ক্রমে হেমন্তকাল এসে গেল। আপেল ও পিয়ার বৃক্ষগুলি অসংখ্য লাল হলুদে ফলের ভারে অবনত হয়ে এল। গাছের সবুজ পাতাগুলিও রৌদ্রকিরণে ঝক্‌মক্ করতে লাগল। নির্মল ও রৌদ্রস্নাত নভোমণ্ডলের গায়ে দূর দিগন্তের ফার বৃক্ষের অগ্রভাগগুলিকে তুলিতে আকা ছবির মত সুন্দর দেখাতে লাগল। দক্ষিণদিকের পাহাড়গুলি যেন দূরে সমতলভূমিতে মিশেছে এবং তারপর উভয়ে একসঙ্গে দূর-দিগন্তের সমুদ্রবেলায় গিয়ে বিলীন হয়েছে।

তারপর এল ঝড়-বাতাসের দিন। সন্ধ্যাবেলায় রেগিণা জানালা বন্ধ ক'রে আলোর সামনে বসে বসে ভাবে। এখন নিজেকে অত্যন্ত ফাঁকা ফাকা মনে হচ্ছে তার। অত বড় অট্টালিকার নিরুদ্ধ নিস্তব্ধতার মধ্যে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ...রেগিণা সারা সন্ধ্যাবেলাটা সেলাই নিয়ে বসে থাকে আর হের ফ্ল্যাটেন তাঁর স্ত্রীর ছোট্ট পড়বার ঘরটিতে বই কোলে নিয়ে বসে থাকেন। এই-ই তাঁদের দু'জনের দৈনন্দিন কার্যতালিকা।

একদিন সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটেন খাবার ঘরে উঠে এসে বললেন, "ফ্রকেন অ্যাজ., এ রকম একা একা বসে থেকে তোমার প্রাণ কি হাঁপিয়ে ওঠে না? এস না, দু'জনে একত্র বসে খানিক গল্পগুজব ক'রে এই নির্জীব একাকিত্বটা ঘোচান যাক্।" রেগিণা আস্তে আস্তে উঠে ফ্ল্যাটেনের ছোট্ট ঘরটিতে এসে বসল। তার মনে

হ'ল, সেই ছোট্ট ঘরটির সঞ্চিত উত্তাপ বেশ যেন আরাম-দায়ক। তারপর হেমন্তের সেই সুন্দর সন্ধ্যাকালে সেলাই কবতে করতে ও বই পড়তে পড়তে কোন এক সময় তারা পরস্পরের প্রতি যেন এক গভীর অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করলে। মনে হ'ল বিদেশ-বিভুঁয়ে দু'জন সম-ব্যথী যেন বহুদিন পর একত্র মিলিত হ'য়েছে। ফ্ল্যাটেন তাঁর যৌবনের কৃচ্ছ্রসাধনার কথা অকপট হৃদয়ে বলতে লাগলেন আর রেগিণা তা অত্যুৎসাহে শুনতে লাগল। রেগিণার কেমন যেন ভয় করতে লাগল, এবাব বুঝি ফ্ল্যাটেন তাব অতীতের কথা জিজ্ঞাসা করে বসেন। কিন্তু সে বিষয়ে ফ্ল্যাটেন উচ্চ-বাচ্য করলেন না।

বেগিণাব সন্দেহ হ'ল, বোধ হয় ফ্ল্যাটেনের কাছে কোন কথাই অবিদিত নাই এবং তাঁর জ্ঞাতসারেই তাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে যাতে করে সে তার অন্তর্দাহ ক্রমশঃ ভুলে যেতে পারে। হয়ত ষড়যন্ত্র করেই তাঁরা তাব হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছেন দয়া করে, দাক্ষিণ্য করে, তাকে তরলমতি ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক মনে করে। তাঁবা চক্রান্ত করেছেন তার বিরুদ্ধে যাতে তাব সদ্যউত্থিত মাতৃত্ববোধ টাকার লোভে চাপা পড়ে যায়। আর সে এতই হীন যে সত্যই সে তা' করেছে। সে সব কিছু ভুলে গিয়ে খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে। সে অবনত মস্তকে সব কিছু অপমান বরদাস্ত করছে। না, তাঁদের চালে কোন ভুল হয়নি, কেননা সে সত্যিই হীনতম আচরণ করেছে এবং সকলের যথেচ্ছ ব্যবহারের পোষকতা করেছে,—মাত্র কয়েকটা টাকার লোভে।

পড়তে পড়তে ফ্লাটেন মাঝে-মধ্যে রেগিণার যৌবন-দীপ্ত সৌন্দর্যের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখছিলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি বই থেকে মুখ তুলে সহাস্যমুখে বললেন, "ফ্রকেন অ্যাজ, কি ভাবছ?"

রেগিণা চমকে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তেই অভ্যাসমত জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, "কই কিছু না ত!"

আবার ফ্ল্যাটেন বই-এ মন দিলেন, আর রেগিণা সেলাই-এ। আগুনের উত্তাপে রেগিণার হাত দু'টিকে রক্তিম দেখাচ্ছে। ফ্ল্যাটেন আড়চোখে সেই সুন্দর হাত দু'টির দিকে মাঝে-মধ্যে লুকিয়ে দেখছেন। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য হ'ল, রেগিণার চম্পকদাম অঙ্গুলিতে কোন আঙ্গুটী নাই। আশা-আকাঙ্খায় তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ঠোঁটের ডগাই কত কথাই না গুঞ্জরিত হ'তে চাইল। কিন্তু তিনি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না।

রেগিণা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করলে সুতরাং ফ্ল্যাটেনও শুভরাত্রি জানাতে বাধ্য হ'লেন। রেগিণার পদশব্দ ক্রমশঃ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল। সেই অপসৃয়মান পদধ্বনির দিকে কান রেখে ফ্ল্যাটেন বহুক্ষণ পর্যন্ত সেইখানে মুহ্যমানের ন্যায় বসে রইলেন। আগুনের উত্তাপ যে ক্রমশঃ কমে আসছে সে দিকে তাঁর খেয়াল নেই। সময়মত কয়েক টুকরো কাঠও যে আগুনে ফেলে দেবেন, তাও ভুলে গেলেন।

রেগিণা নিজের ঘরে খাটের ওপর বসে আলোর দিকে চেয়ে

চেয়ে ভেবে চলেছে। ভাবছে তার সেই সনাতন চিন্তা—তাব ছেলেটি এখন কোথায়, কেমন আছে, এই সব। সে প্রতিজ্ঞা কবলে, যেমন কবেই হোক এ সংবাদটুকু তাকে বার কবতেই হবে। সে কেবল এইটুকু জানে যে তাব ছেলেটি এই পৃথিবীব কোথাও না কোথাও বাজাব হালে প্রতিপালিত হচ্ছে। এব বেশী জানবার তাব সুযোগ হয়নি। সুতবাং পুত্রেব অবস্থান সম্বন্ধে নানারূপ সম্ভাবনাব কথা তাব মনে উদিত হতে লাগল। যতই সে এ বিষযে চিন্তা করতে লাগল, ততই তার মন অধীব হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে অধীব আগ্রহে একদিন সে প্রফেসবকে একখানা চিঠি লিখে ফেললে।

বহুদিন, বহুসপ্তাহ বেগিণা অপেক্ষা কবে কাটিয়ে দিলে কিন্তু অধ্যাপকেব দিক থেকে পত্রেব কোন জবাব এল না। সে রেগে গিয়ে ভাবলে, সকলেই আমাব এই আগ্রহকে একটা নিছক খেয়াল বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। দোলানে চেয়াবের দোলানি থামিযে সে ভাবতে বসল, অবশেষে সে সত্যসত্যই পাগল না হযে যায়।

তাবপর থেকে বেগিণাব দিনগুলি অদ্ভুতভাবে কাটতে লাগল। সে প্ল্যানের পর প্ল্যান কবে চলল, কিন্তু কার্যতঃ কিছুই কবতে পাবলে না। মানষিক ধৈর্য হারিয়ে সে হতাশাব সঙ্গে ভাবতে বসল, তার জীবনেব এই দুঃখ-নিশা কোন দিনই কি শেষ হবে না?

এই মিথ্যার খাঁচা থেকে ছাড়া পাবার জন্যে সে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। এমনি করে সময় বয়ে চলল এবং ক্রমে শীতকাল এসে গেল।

নয়

বড়দিনের পর একদিন বেগিণা বেড়াতে বেড়িয়ে দারুণ মাথাধরা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এল। বিকেলের দিকে এল ভীষণ জ্বর। ছোট্ট মেয়েটির মত সে কাঁদতে সুরু করে দিল। সারা বুকে-পিঠে নিদারুণ ব্যথা নিয়ে সে সারাদিন নিঝুমের মত শুয়ে রইল। তার চোখের সামনে সব কিছু যেন দুল্‌তে লাগল। চোখেব ওপর নেমে এল গাঢ অন্ধকাব।

ঘুম ভাঙ্গতে রেগিণা দেখল, ঘরের ভেতর একটি মৃদু বাতি জ্বলছে আর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর লিণ্ড্রোম্‌। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রেগিণাব মনে হ'ল যেন তার নিজের ছেলেটিই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার প্রথমে বেগিণাব শরীরের উত্তাপ দেখলেন তারপর তার বুক ও পিঠ পবীক্ষা করতে চাইলেন। রেগিণা ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। এইবাব বুঝি সে ধরা পড়ে যায় যে সে এক সন্তানেব জননী। তাড়াতাড়ি দু' হাতে সে তার নৈশ-পোষাকটি চেপে ধরল। ডাক্তার মৃদু হেসে আস্তে ক'রে তার হাত দুটি সরিয়ে দিয়ে তার জামাটি খুলে ফেললেন। তারপর পরীক্ষা শেষ ক'রে তিনি তাকে গরম কাপড় ঢাকা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিলেন। যাবার সময় ফ্ল্যাটেনকে বলে গেলেন যে মেয়েটির নিম্যুনিয়া হ'য়েছে। কথাটা রেগিণার কাণে গেল

কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করল না। তার তখন একমাত্র চিন্তা—ডাক্তার টের পেয়েছেন কি না!

সারারাত্রি ধরে মুখ ফ্যাকাশে করে ফ্ল্যাটেন নীচের তলায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালেন। তিনি মাঝে-মাঝে তাঁর স্ত্রীর সজ্জিত তৈলচিত্রটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাকিয়ে দেখতে সাহস পেলেন না, তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে পালিয়ে গেলেন। তারপর তিনি পা টিপে টিপে রোগিণীর কক্ষদ্বারে দাঁড়িয়ে কাণ পেতে কি যেন শুনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে তাঁর সাহস হ'ল না। তিনি পা টিপে টিপে আবার যখন নীচে নেমে গেলেন, বাইরের হিমেল বাতাস তখন গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে সন্‌ সন্‌ করে বইছে। সারারাত্রি ধরে হাতে বাতি নিয়ে তিনি নিশাচরের মত এ-ঘর ও-ঘর ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

পরদিনও ফ্ল্যাটেন অফিসে গেলেন না। ডক্টর লিণ্ড্রোম যখন সকালে রুগী দেখে নীচে নেমে এলেন ফ্ল্যাটেন তখন ভীত সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার ভরসা দিলেন, বয়স কম ও স্বাস্থ্য ভাল বলে মেয়েটি এ-যাত্রা বোধ হয় টাল সামলে উঠতে পারবে।

দু'দিন ধরে বেশীর ভাগ সময়ই রেগিণা অচৈতন্যের ঘোরে পড়ে রইল। ফ্ল্যাটেনের আদেশে একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা সব সময়েই তার শিয়রের কাছে বসে থাকত। সেই বৃদ্ধা রেগিণার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবত, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত সেরে উঠ্‌বে ত?

একদিন রাত্রে রেগিণা হঠাৎ জেগে উঠে কেমন এক দৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধাটির দিকে চেয়ে, অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যানা, এখুনি তোমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে যে!"

"চিঠি? মা-কে লিখবেন বুঝি?"

রেগিণার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন গেল বেড়ে—কিন্তু সে পূর্বের মত স্থিরদৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললে, "মা? মা ত অনেক দিন হ'ল মারা গেছেন। আমি আজ তোমাকে একটা গোপন কথা বলতে চাই, কিন্তু সাবধান—আর যেন কেউ সে কথা না জানতে পারে। জান, আমার একটি........."

এই পর্যন্ত বলেই তার দম আটকে এল। সে পুনরায় নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ বুজে শুয়ে রইল।

মধ্যরাতে রেগিণা হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠল, "ওকে আমার কোলে দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, ওকে আমার কোলে ফিরিয়ে দাও।"

বৃদ্ধাটি তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, "চুপ করুন, অত কাঁদবেন না—একটু স্থির হন।"

"দেখছনা ও কেমন তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কিছুতেই ফিরিয়ে দেবে না আমাকে? আমি তাকে নিজের হাতে খুন করেছি—ওঃ আমি কি করেছি, আমি কি সর্বনাশ করেছি।"

দীর্ঘ একমাস ভুগে রেগিণা ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে বিছানায় উঠে বসল। পূর্বের মতই ঘটা করে তার সেবা-শুশ্রূষা

হ'তে লাগল। দামী দামী ওষুধে ও পথ্যে তার শয্যাপার্শ্ব ভরে উঠল। বাড়ীশুদ্ধ লোক যেন তার অনুমাত্র আদেশের অপেক্ষায় তটস্থ হয়ে আছে। ফ্ল্যাটেন নিজে অন্তরালে থেকে স্নেহভবে তার সমস্ত সেবার ভার পরিচালনা করতে লাগলেন। রেগিণার কাছেও সে কথা অজানা রইল না।

রেগিণা যেন নবজন্ম লাভ করেছে। ফ্ল্যাটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার সারা দেহ-মন ভরে উঠল। একদিন আয়নায় মুখ দেখে সে প্রথম উপলব্ধি করলে যে তার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবল, এ ভালই হয়েছে, সৌন্দর্যে আর আমার কি কাজ?

এখন থেকে তার ভবিষ্যতের সমস্ত চিন্তা ঐ ছোট্ট অন্তরালবর্তী শিশুটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগল। সূর্যের রশ্মি দেখে তার মনে হ'তে লাগল, ছেলেটি বুঝি তার অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের কোণে রক্ষিত লতাগাছের চারাটি যেমন সর্বদা জানালার দিকে বেড়ে চলে, তেমনি রেগিণার সমস্ত চিন্তাধারাই এখন হ'তে ঐ শিশুটির দিকে প্রসারিত হ'তে লাগল। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে রেগিণার কল্পনা করবার সাহসও যেন অসম্ভব বেড়ে গেছে। এখন সব কিছু অসুবিধাই তার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হ'তে লাগল। আত্মীয়-স্বজনের ভীতি, লোকেদের নিন্দা-সুখ্যাতি, বিবাহিত জীবনের আকাঙ্খা—প্রভৃতি যে সব আবেগের মূলোৎপাটন করতে তাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হ'ত এতদিনে সে প্রয়োজন

ফুরিয়ে গেল। সেই সব আবেগ যেন আপনা হ'তেই ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল—সেই একটি মাত্র প্রোজ্জ্বল চিন্তার একাগ্রতায়।

হাতে কোন কাজ নেই। কর্মহীন অবসাদে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেগিণা পুত্রের স্বপ্ন দেখছে। মনে মনে তাকে জামা-কাপড় পড়াচ্ছে আর ছাড়াচ্ছে। এমনি নিরুদ্দম অবসরে হাসপাতালে শুয়ে থাকার অলস দিনগুলির স্মৃতি স্পষ্টভাবে তার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল।

এমনি ভাবে ফেব্রুয়ারীর সুখকর রৌদ্রের দিনগুলি চলে গিয়ে বসন্তকালের সূচনা দেখা দিল। রেগিণার মন এখন এক অকারণ আনন্দে সর্বদা ভরপুর। যেমন কেউ কোন একটি স্থির-সংকল্পের দিকে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাকিয়ে থাকে, তেমনি আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে রেগিণা বসন্তের সূর্যকিরণস্নাত আমেজি দিনগুলির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল।

রেগিণা প্রফেসরকে আবার একখানা চিঠি লিখলে। সে মন স্থির করে ফেলেছে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সে আমেরিকায় চলে যাবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে সেখানে কাপড় কেচে, না হয় সেলাই করে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেবে। মাতা-পুত্রে উভয়ে যদি একত্র থাকতে পারে, তা'হলে কষ্ট বা লোকনিন্দা,—কিছুই সে গ্রাহ্য করবে না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু প্রথমবারের মতই অধ্যাপক নিরুত্তর রইলেন।

একদিন প্রাতঃরাশের টেবিলে রেগিণা ফ্ল্যাটেনের গুটেনবার্গ থেকে লেখা একখানা চিঠি পেল। একটা অস্বস্তিকর সম্ভাবনার কথা মনে পড়ায় চিঠিখানা খুলতে গিয়ে রেগিণার হাত কেঁপে গেল। পড়ে দেখলে, সে যা' ভয় করছিল ঠিক তাই ঘটেছে—ফ্ল্যাটেন বিবাহের প্রস্তাব করেছেন।

অনেকক্ষণ ধরে চিঠিখানির দিকে রেগিণা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। নারীর সহজাত মনোবৃত্তিতে সে খানিকক্ষণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে বসে রইল। চিন্তা করলে, যদি এই প্রস্তাবে মত দেয় তা'হলে সমাজে সে এক মর্যাদাপূর্ণ আসন পাবে। লোক হিসেবে ফ্ল্যাটেন সত্যিই খুব চমৎকার! কিন্তু তাঁকে সব কথা খুলে বলা কি সম্ভব? না তাঁর সঙ্গে সারাজীবন সে প্রতারণাই করে যাবে? রেগিণা মাথা নেড়ে, মনে মনে উচ্চারণ করলে, এ অসম্ভব,.একেবারেই অসম্ভব!

রেগিণা অনেক ভেবে দেখলে যে এই ঘটনার পর আর এ বাড়ীতে তার থাকা চলে না। কিন্তু কোথায় যাবে সে? এই মুহূর্তেই তাকে মনস্থির করতে হবে। কয়েক শ' ক্রোণার মাত্র তার হাতে জমেছে। আটলান্টিকের ওপারে পালিয়ে যেতে ঐ সম্বলটুকুই যথেষ্ট।

ফ্ল্যাটেন গুটেনবার্গ থেকে ফিরে এলেন। লজ্জায় ও উৎকণ্ঠায় তিনি রেগিণার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারলেন না। তাঁরা উভয়ে খেতে বসে নীরবে আহার শেষ করে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলায় ফ্ল্যাটেন তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে একা বসেছিলেন, হঠাৎ রেগিণাকে সেখানে আসতে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। ম্লান হেসে তিনি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। রেগিণা কিন্তু বসল না। কিছুক্ষণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললে, "আমি নরওয়ে ফিরে যাব স্থির করেছি।"

ফ্ল্যাটেন চেয়ারে মুসড়ে বসে পড়লেন। হাতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি চিন্তিতমুখে বসে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, "তুমি কি চিরদিনের মত চলে যাচ্ছ?"

"হ্যা, ঠিক করেছি সেখান থেকে আমেরিকায় চলে যাব।"

একটা কলম দিয়ে ব্লটিং-এর ওপর হিজিবিজি কাট্‌তে কাট্‌তে ম্লান হেসে ফ্ল্যাটেন বললেন, "আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও? বেশ, আমি বাধা দেব না। আশা করি আমার ওপর রাগ করে যাচ্ছ না। আর একটি অনুরোধ! যদি কখনও প্রয়োজন বোধ কর, আমার কাছে সাহায্য চাইতে দ্বিধা বোধ ক'রো না। এই করুণাটুকুই তোমার কাছে চাই।"—এই কথা বলে হের্‌ ফ্ল্যাটেন গভীর স্নেহভরে রেগিণার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

রেগিণা মন স্থির করে ফেলেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সে চলে যেতে পারে, ততই মঙ্গল।

দশ

মার্চমাসে একদিন সকালবেলায় রেগিণা নরওয়েগামী ট্রেনে চেপে বসল। গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর পেরিয়ে পশ্চিমমুখো ট্রেন উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। রেগিণাব কিন্তু মনে হ'তে লাগল, খুব মন্থর গতিতে চলেছে ট্রেনটি। একবার তার মনে হ'ল এখনও ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে তার পুবনো জীবনে ফিরে যাবার সময় আছে। এ যাত্রার ফলাফল যখন অনিশ্চিত, ফিরে যাওয়াই কি সুবুদ্ধির কাজ নয়?

রেগিণার মনে হচ্ছে, এতদিন যে তীরে সে তার অতীত জীবনের নৌকা ভিঁড়িয়েছিল, তা' থেকে সে যেন দূরে, বহুদূবে সরে যাচ্ছে! সব কিছু ত্যাগ করে যে নতুন তীর অভিমুখে এখন সে ছুটে চলেছে, সেখানেই বোধ হয় তার ক্ষুদ্র শিশুটি তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে!—কিন্তু যদি তার সন্ধান না পাওয়া যায়? তা'হলে এই বিপদ-সঙ্কুল অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া কি নিরর্থক হবে না? কি লাভ হবে তাব ভবিষ্যৎ জীবনকে ছন্নছাড়া, ভবঘুরের মত ব্যর্থ হ'তে দিয়ে? কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সমস্ত পথ কি সে নিজের হাতেই বন্ধ কবেনি?

ক্রিষ্টিয়ানা ষ্টেশনে পৌঁছে রেগিণা মাল-পত্র ওয়েটিংরুমে জিম্মা করে দিয়েই সোজা হাসপাতালে ছুটে গেল। একটা উপযুক্ত বাসস্থানও যে পূর্বে খুঁজে রাখা দরকার, সে বিষয়েও

রেগিণা সম্পূর্ণ উদাসীন। হাসপাতালে সহকারী ডাক্তারের সঙ্গেই প্রথম দেখা। তিনি জানালেন যে অধ্যাপক হঠাৎ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। রেগিণা তার কাছ থেকেই অধ্যাপকের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডেকে তা'তে চড়ে বসল।

ড্রামেন রোড ধরে গাড়ী ছুটে চলেছে অধ্যাপকের সহরতলীর বাসভবনের দিকে। রেগিণার তখন অধৈর্য অবস্থা—কোন রকম দেরীই সহ্য হচ্ছে না। রাস্তায় ট্রামগাড়ী পারাপারের জন্যে কোচ্‌ম্যানকে মাঝে-মাঝে গাড়ী থামাতে হচ্ছিল বলে সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল।...অবশেষে একটা বড় পাথুরে বাড়ীর তেতলায় পৌঁছে রেগিণা দরজার কড়া নাড়লে। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিয়ে এপ্রণে হাত মুছতে মুছতে জানালে যে অধ্যাপকের বাড়াবাড়ি রকম অসুখ!

রেগিণা তাকে অনুরোধ করে বলল, "আমি অধ্যাপকের সঙ্গে একটি বার মাত্র দেখা করতে চাই।"

পথশ্রান্ত রেগিণার ময়লা জামা-কাপড় ও উস্‌কো-খুস্‌কো চুল দেখে পরিচারিকাটির তাকে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত বলে বোধ হল না। সুতরাং সে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হ'ল। রেগিণা তাড়াতাড়ি তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললে, "আমার খুবই দরকার—অন্তত অধ্যাপকের স্ত্রীকে একটিবার ডেকে দাও।"

বৃদ্ধা রুখে উঠে বললে, "কি! জোর করে ঢুকবে নাকি? ভাল চাও তো পথ ছেড়ে দাও বলছি!"

"অনুগ্রহ করে তোমাদের কর্ত্রী ঠাকরুণকে একবার ডেকে দাও।"

অনেক করে পরিচারিকাকে রাজী করালে রেগিণা। কিছুক্ষণ পরে একজন পক্ব-কেশী বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে রেগিণাকে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

রেগিণা কাতরকণ্ঠে বললে, "এই বিপদের সময় আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি সত্যিই লজ্জিত। আপনার স্বামীকে আমি কেবল একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে তাঁর উত্তরের ওপর।"

"আপনি কি করে কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে?—আমার পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি? কে আপনি?"

রেগিণা চোখে হাত চাপা দিয়ে বললে, "নাম বললে কি চিনতে পারবেন আমাকে? তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে একবার জিজ্ঞাসা করুন, এক বৎসর পূর্বে হাসপাতালে এসে কারা আমার ছেলেটিকে দত্তক নিয়েছিলেন?"

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর এই প্রথম রেগিণা নিজের গোপন কলঙ্কের কথা নিজমুখে উচ্চারণ করলে। বৃদ্ধা মহিলাটি একবার তার দিকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে ঈষৎ বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "ডাক্তারের অনুমতি পেলেই আমি তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করব। কাল না হয় একবার আসবেন।"

রেগিণা অগত্যা ক্লান্তভা.ব আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি! কিন্তু হঠাৎ তার মনে হ'ল আজ রাত্রেই যদি অধ্যাপক মারা যান? রেগিণার মাথা ঘুরে গেল। কোন গতিকে সে নিজেকে সামলে নিলে।

রাস্তাঘাট শব্দময় ও জনাকীর্ণ। তবুও রেগিণার মনে হ'ল সে যেন এক জনহীন মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে হেটে চলেছে। এই চলমান জনসমুদ্রের সঙ্গে তার যেন কোন প্রাণসংযোগ নেই। এখন এ পৃথিবীতে কেবলমাত্র একজনের সঙ্গেই তার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান। তাকে খুঁজে বের করাই এখন তার একমাত্র কাজ। কিন্তু সন্ধান যদি না পায়, কি উপায় হবে তার?

সে কাল-রাত্রি যেন আর কাটতে চায় না। পরদিন প্রত্যূষে আবার বেগিণা অধ্যাপকের গৃহদ্বাবে উপস্থিত হ'ল। পূর্বদৃষ্ট পরিচারিকাটি এসে নিম্নস্বরে জানালে যে অধ্যাপকেব অবস্থা এখন-তখন। বহু অনুনয়-বিনয়ের পর অধ্যাপকেব স্ত্রী বেরিয়ে এলেন এবং তাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন। ফিরে যাবাব উপক্রম করে বিরক্তস্বরে বললেন, "আবার কি আপনি জ্বালাতে এলেন? দেখছেন না, আমাদের মাথার ওপব কতবড় বিপদ!"

রেগিণা কিছুক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মত স্থির-গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ছুটে গিয়ে, মহিলাটির হাত দু'টি

জড়িযে ধবে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যাব মত মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মহিলাটি চম্‌কে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, মেযেটি উন্মাদ নয় ত ?

বেগিণা চীৎকাব করে বলে উঠল, "এক মিনিটের জন্য আপনাকে আমাব কথা শুনতেই হবে। এ পৃথিবীতে একমাত্র আপনার স্বামীই জানেন আমাব ছেলেটি কোথায় আছে। ভগবানেব দোহাই, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করুন। এরই জন্যে আমি সুইডেন থেকে ছুটে আসছি। স্বেচ্ছায একদিন আমি আমাব সন্তানকে পরিত্যাগ কবেছিলাম বটে কিন্তু এখন আমি অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। আমি আমাব ছেলেকে ফিবে পেতে চাই। অধ্যাপকেব জীবন থাকতে থাকতে তাঁকে এই একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করুন। নইলে আমি পাগল হয়ে যাব, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা কবব। এই অভাগীনীকে দয়া করুন"—এই কথা বলতে বলতে বেগিণা বিহ্বলভাবে কাঁদতে লাগল।

ভদ্রমহিলা বেগিণাব এই উচ্ছ্বসিত কান্নায় কিছুটা নরম হ'লেন। ঝুঁকে পড়ে তার গালে টোকা দিতে দিতে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, "অত উতলা হোয়োনা মা, যদি তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে, আমি তাঁকে নিশ্চয়ই এ' কথা জিজ্ঞাসা করব। কাল বিকেলে একবাব এসো।"

অবশেষে ভদ্রমহিলা স্বীকৃতা হয়েছেন। সেই উত্তেজনায় রেগিণার বুকে আবার নতুন বল এল। আবার তার মন

আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, কাল সে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ পাবে।

অনেকক্ষণ ধরে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সহরের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক একটি মিনিট যেন তার কাছে দীর্ঘ এক একটি যুগ বলে বোধ হচ্ছে। তার চারিদিক ঘিরে যেন এক জনহীন, শব্দহীন পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে আর সে তার ঠিক মধ্যেখানে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই নিস্তব্ধ পৃথিবী তাকে হিমানীস্পর্শ দেবে, কি একটি আরামপ্রদ উত্তাপ-বিকীর্ণ গৃহকোণের সন্ধান দেবে, কালই তা নির্ধারিত হবে। কাল,—মধ্যে আব একটি দিন মাত্র! অকস্মাৎ নিজের অজান্তে রেগিণা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করতে বসল। এখন সে যেন চোখের সামনে উদ্দীপ্ত আলোর রেখাটিকে দেখতে পাচ্ছে। তার মনে হ'ল, এইবার সে রৌদ্রকিরণ-স্নাত পাহাড়ের চূড়ায় আবোহণ ক'রে সাক্ষাৎ ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পেরেছে। তার সমস্ত অবিশ্বাস ও দুশ্চিন্তার বোঝা যেন মন্ত্রবলে চিরদিনের জন্য কাঁধ থেকে খসে পড়ল।...অবশেষে গভীর রাত্রে রেগিণা হোটেলে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল। তার কেমন যেন স্থির বিশ্বাস হ'ল, ঈশ্বর তার কাতর প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনেছেন।

পরের দিন সকাল ন'টায় রেগিণা কফি না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। অধ্যাপকের বাড়ীর দরজায় পেঁ।ছে দেখল বাড়ীর সামনে

অনেকগুলি গাড়ী সারিবন্দী ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং অনেক লোক বাড়ীব সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছেন। এক অজানা আতঙ্কে তার প্রাণের ভেতরটা তুরু তুরু করে কেঁপে উঠল। সে বোকাব মত ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে, অধ্যাপক গৃহিনী একটা চেয়ারে বসে অঝোর-নয়নে কাঁদছেন আব জন কয়েক লোক ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কবছেন। অদূবে একটা খাটে অধ্যাপক স্থিব হয়ে শুয়ে আছেন যেন! রেগিণা দ্রুতপদক্ষেপে বিছানার ধারে গিয়ে অধ্যাপকেব হাতখানি জড়িয়ে ধরল। দেখলে হাতখানা শক্ত ও বরফেব মত ঠাণ্ডা।

লোকগুলি রেগিণার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। রেগিণা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না কবে, বিবর্ণ মুখে অধ্যাপক-গৃহিনীর কাছে ছুটে গিয়ে কাতব, ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমার কথা কি কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?..."

অধ্যাপক-গৃহিনী সজল চক্ষুদুটি তুলে, অপদস্তভাবে একবার তাব মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, আহত ব্যাঘ্রীর মত সে চোখ দুটি জ্বলছে। অনেক কষ্টে শক্তি সঞ্চয় কবে, মৃদুকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "কিছুই জানা সম্ভব হয়নি, এমনকি, তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না।"

সেই মুহূর্তে রেগিণার পায়ের নীচের মাটি যেন দুলে উঠল!

এগার

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পশ্চিম ষ্টেশনে কর্মরত একজন পুলিশম্যান লক্ষ্য করলে যে সমুদ্রের বেলাভূমিতে একটি অস্পষ্ট মূর্তি উদ্‌ভ্রান্তের মত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই মূর্তিটি কালো জলের ওপর যে কয়েকটি আলোক-রেখা দুলছে, সেইদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আকৃতিটিকে দেখে স্ত্রীলোক বলেই বোধ হ'ল। রাত্রি বারোটার সময় আলোগুলি নির্বাপিত হবে, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় তারই অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল! পুলিশম্যানটি দ্রুত সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। দেখলে, মেয়েটি টেলিফোনের একটা খুঁটির নীচে পথের ওপর বসে পড়েছে।

মেয়েটির চলা-ফেরা কেমন যেন সন্দেহজনক বলে ধারণা হ'ল পুলিশটির,—তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার এই ভেবে পুলিশটি মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে কিনা!

মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতেই গ্যাস-বাতির স্তিমিত আলো এসে তার মুখের ওপর পড়ল। ধীরে ধীরে সে উচ্চারণ করলে, "অসুখ ?—কই, না ত!"

"তবে ? আপনি কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন ?"

"কেন, আমার কি এখানে বসবার অধিকার নেই নাকি ? আমি ত কারও কোন অসুবিধা করছি না।"

"কোথায় থাকেন আপনি এখানে?"

"কি আশ্চর্য! একটু বসেছি এখানে, তা'তে এত কথাব দরকার কি? একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবারও কি উপায় নেই?"

"তা' থাকবে না কেন? তবে কিনা—অনেক রাত হয়েছে—তাই......"

কয়েক পা অগ্রসর হয়ে পুলিশম্যানটি আবার থমকে দাঁড়াল। মেয়েটি ততক্ষণে তার উপস্থিতি বে-মালুম ভুলে গেছে। সে শান্ত জলের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাগলেব মত চিন্তা করতে লাগল, না তোব মত স্ত্রীলোককে দয়া দেখানোও পাপ। যারা গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে তারাও বোধ হয় ক্ষমার যোগ্য; কিন্তু যে বমণী তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে নিজের সন্তান অজ্ঞাত লোককে বিলিয়ে দেয় সে ক্ষমারও যোগ্য নয়। তোর মত স্ত্রীলোকের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হলো ডুবে মরা···

পুনরায় উত্তেজিতভাবে মাতালের মত টলতে টলতে মেয়েটি অস্থির পদচারণা করতে লাগল। সহরে এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব, কেননা, সেখানে প্রতিটি প্রাণীর অঙ্গে লেগে রয়েছে তুষার-শীতল আর্দ্রতা। বাঁচবার আর কোন পথ খোলা নেই। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন জীবনকে অন্ধকারেব চেয়েও অনাকাঙ্খিত বোধ হয় আবার মরণও তখন ঘৃণাভরে দূরে সরে দাঁড়ায়—স্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ করে!

হঠাৎ পেছনে নাল দেওয়া ভারী জুতোর খট্‌খটে আওয়াজ শুনে সে চম্‌কে তাকিয়ে দেখলে সেই পুলিশটি আবার ফিরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করছে, তাকে গাড়ী ডেকে দিতে হবে কিনা! কোন জবাব না পেয়ে সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানা গাড়ী এনে হাজির করলে। সমস্ত ঘটনা-গুলো যেন ভোজবাজীর মত মুহূর্তে ঘটে গেল। মেয়েটি অগত্যা হোটেলের ঠিকানা দিয়ে উঠে বসতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।

চলন্ত গাড়ীতে যেতে যেতে হঠাৎ মেয়েটির একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করলে, ডক্টর ফোল্ডন্‌! ডক্টর ফোল্ডন্‌!! এই সহরেই ডক্টর ফোল্ডন্‌ বাস করেন এবং তিনিই তার এই সব দুঃখ-কষ্টের মূল। হয়ত তিনিই ছেলেটিকে লুকিয়ে রেখেছেন, অন্ততঃ জানেন কোথায় ছেলেটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বোধ হয় তিনিই নিজের সন্তানকে দারিদ্র্য-নিপীড়িত বিড়ম্বনাময় জীবনযাত্রা থেকে রক্ষা করতে গোপনে তার ভার গ্রহণ করেছেন। ছেলেটির মায়ের ভারও তিনি নিতে চেয়েছিলেন তাই একটি আরামপ্রদ সুখাশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছিলেন তাকে। কোন লোককে যত খারাপ ভাবা যায় প্রকৃতপক্ষে সে হয়ত তত খারাপ নয়।

দুলে দুলে গাড়ী চলেছে; রাস্তার সঙ্গে ঘসণে চাকা থেকে একটা ঘর্ঘর শব্দ উঠছে। এখন গাড়ী চলেছে কার্ল জোয়ান ষ্ট্রীট অতিক্রম করে। আধো-অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা-ঘাট প্রায়

নির্জন। হঠাৎ মেয়েটি চীৎকার করে উঠল, "কোচ-ম্যান্‌, তুমি ডক্টর ফোল্ডনের বাড়ী চেন কি ?"

গাড়ীর গতিবেগ থামিয়ে ক্যোচ্‌ম্যান ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েটি কিছু বলছে কিনা! তারপর সে নেমে এল। পকেট থেকে একটা নোট-বুক বার করে, রাস্তার মৃদু আলোতে খানিকক্ষণ ধরে উল্টে-পাল্টে সেখানা দেখে নিলে। হ্যাঁ, এইত পাওয়া গেছে ডক্টব ফোল্ডনের ঠিকানা! সেই ঠিকানায় কি গাড়ী নিয়ে যেতে হবে ?-- -কিছুক্ষণের মধ্যেই ইউনির্ভার্সিটি রোড্‌ পেরিয়ে গাড়ী নির্ধারিত ঠিকানায় এসে উপস্থিত হ'ল। রেগিণা ভাড়া চুকিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে।

ঐ ত গৃহদ্বারে ডক্টব ফোল্ডনের নামাঙ্কিত ফলক ঝুলছে! বিশেষ কিছু না ভেবেই রেগিণা দরজা-সংলগ্ন ঘণ্টাটা ধরে নাড়া দিলে। বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন সাড়া-শব্দ নেই। নিকটেই একটা ঘড়িতে একটাব ঘণ্টা পড়ল। থেকে থেকে দু' একটা গাড়ীব ঘর্ঘব-শব্দ ভেসে আসতে লাগল। রাস্তাব জীবনস্পন্দন প্রায় থেমে এসেছে। রেগিণা সিঁড়িতে বসে পড়ল। তার চিন্তাশক্তি যেন ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। মানুষের যতখানি সহনশীলতার ক্ষমতা, সে তার শেষ সীমা লঙ্ঘন করেছে। সমস্ত সম্মান ও অভিমান বিসর্জন দিয়ে সে সেই লোকটির কাছেই ছুটে এসেছে, যে তাব সমস্ত জীবন-যৌবনকে ব্যর্থ ও পঙ্গু করে দিয়েছে। এত ঘটনার পরও কি সম্মান ও মর্যাদার কোন মূল্য আছে তার কাছে ?

সে অপেক্ষা করছে ত করছেই। বেশ কিছুক্ষণ পর দোতলার একটা জানালা খুলে গেল। কে একজন সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি তার প্রয়োজন! বেগিণা জানালে যে সে ডক্টর ফোল্ডনের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

জানালা বন্ধ হয়ে গেল এবং কয়েক সেকেণ্ড পরেই একজন পরিচারিকা নেমে এসে সদর দরজা খুলে দিলে এবং তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সিঁড়িতে উঠে বেগিণার পা যেন আর চলে না। তার বুক ধরফর করতে লাগল। চমকে উঠে ভাবলে, ছিঃ, এ কি করেছি আমি? মাঝ রাতে আমাকে এমনি অবস্থায় দেখলে না জানি কি ভাববেন তিনি। হয়ত বদ্ধ পাগল বলেই ধারণা করে বসবেন।

পরিচারিকা তাকে বসবার ঘরে বসিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে চলে গেল। বেগিণাও নিষ্প্রাণের মত একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

অবশেষে ভারী পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ডক্টর ফোল্ডন ঘরে প্রবেশ করলেন। বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি তার, কেবল সরু গোঁপের সঙ্গে ছুঁচলো দাড়ি রেখেছেন থুতনিতে। তাড়াতাড়িতে তিনি সার্টের ওপর একটা সিল্কের টাই পড়ে নিয়েছেন। তিনি ঘরে ঢুকে 'শুভসন্ধ্যা' জানিয়ে বললেন, "চলুন, আমি প্রস্তুত,—রোগীর অবস্থা কি খুবই খারাপ?"

রেগিণা দাঁড়িয়ে উঠে কোন রকমে 'শুভসন্ধ্যা' উচ্চারণ করলে। ফোল্ডনের হঠাৎ মনে হ'ল, বক্তার কণ্ঠস্বরটি যেন খুবই পরিচিত। তিনি আরও কাছে এগিয়ে এসে তাকে দেখেই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রেগিণাও যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলেছে। এ সময় কি বলা উচিত, না উচিত, তার যেন কিছু মাথায় আসছে না। তাঁরা উভয়ে নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পর ডক্টর ফোল্ডন আম্‌তা আম্‌তা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন। রেগিণা তার অপদস্থ ভাব দেখে উল্লসিত হয়েছে। তার মনে হল, ডক্টর ফোল্ডন যেন ভূত দেখার মত ঘাবড়ে গেছেন। তার ভারী ইচ্ছে হ'ল, একবার উচ্চকণ্ঠের দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু কষ্টে সে-ইচ্ছা দমন করে স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, "মাপ করবেন, আপনাকে অধিক রাত্রে বিরক্ত করলাম। আমার ছেলেটি কোথায়, সেই কথাই জানতে এসেছি। তাকে ফিরে না পেলে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, আমার কি অবস্থা হবে।"

ডক্টর ফোল্ডন জানালার কাছে সরে গিয়েছিলেন, এইবার তিনি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে পর্দাটা টেনে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ রেগিণার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন, "বল কি! তোমার ছেলে? তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে?"

বেগিণা হঠাৎ উন্মাদের মত অসংলগ্ন অট্টহাসি হেসে উঠল। সেই গলা-ফাটানো অট্টহাসি নিস্তব্ধ বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অস্বাভাবিক প্রতিধ্বনি তুললে। মন্ত্রমুগ্ধের মত ডক্টর ফোন্ডন তার দিকে এগিয়ে এসে প্রলাপের মত বলতে সুরু করলেন, "আস্তে, বেগিণা আস্তে, লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমি··· তোমার ছেলে···আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা—সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে!" এই কথা বলতে বলতে তাঁর হঠাৎ একটা সাংঘাতিক সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল।

"শুভরাত্রি, ডক্টর ফোন্ডন, এখন বুঝছি আমারই ভুল হয়েছে," এই কথা বলে বেগিণা দরজার দিকে পা বাড়াল।

ডক্টর ফোন্ডন তার পথরোধ করে দাঁড়ালেন। আবেগভরে বললেন, "এ সব কথার মানে কি? তোমাকে অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছে বেগিণা। তুমি কত বদলে গেছ। তুমি কি সুখী নও? তোমার কোন খবরই আমি জানি না। তোমার কোন উপকারেই কি আমি আসতে পারি না?"

নিজেকে তার কবল-মুক্ত করে বেগিণা ধীর অকম্পিত স্বরে উত্তর দিলে, "না, আমি মোটেই অসুখী নই। সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই আমার — ধন্যবাদ।"

এই কথা বলে বেগিণা নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারো

হোটেলের একটি ছোট কামরায় বেগিণা শুয়ে আছে। ঘরের ভেতরে জমাট অন্ধকার, কিন্তু বাইরের গ্যাসবাতির এক টুকরো আলো এসে ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। জামাকাপড় না ছেড়েই বেগিণা বিছানায় শুয়ে পড়েছে। হাতের ওপর মাথা রেখে অর্ধনিমীলিত নেত্রে বেগিণা শুয়ে শুয়ে রাজ্যের ভাবনা ভেবে চলেছে।

জীবনে এমন দুঃখ আছে যা হয় চোখের জলে গলে গিয়ে মনকে হালকা করে দেয়, না হয় মানুষকে বোবা করে দেয়। আবার এমনও দুঃখ আছে যা মানুষকে এক ভাসমান বরফখণ্ডের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মানুষ তখন মাটির স্পর্শ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এমনি দুঃখে মানুষ কাতর হয় না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না, এমন কি চোখের জল পর্যন্ত ফেলতে ভুলে যায়। প্রথমে মনে হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন অসার হয়ে গেছে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চিন্তাশক্তি ফিরে আসে। তখন সে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে এক চাঁই বরফ খসিয়ে ফেলে তারই সাহায্যে দাঁড়ের মত জল কাটতে চেষ্টা করে। মুহূর্তপূর্ব পর্যন্ত যে নিজেকে অক্ষম ও হতভাগ্য বলে আক্ষেপ করছিল, হঠাৎ সে যেন অসুরবীর্য ধারণ করে। শুধু বাঁচবার জন্যেই আকুলি-বিকুলি নয়, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কিছু সম্পাদন করবার জন্যেই যেন সে বদ্ধপরিকর।

কয়েক ঘণ্টা চুপ করে পড়ে থেকে রেগিণা উঠে বসল। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললে, লজ্জা করেনা তোমার চোখের জল ফেলতে ? আবার এক ঝলক তিক্ত হাসি হেসে পুনবায় সে হাতের ওপব মাথা বেখে শুয়ে পড়ল।

এতদিন সে যেন একটি অর্ধ উন্মুক্ত দবজার সামনে ঠাই দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে উঁকি দিয়ে ছেলেকে সে একটু-আধটু দেখতে পাচ্ছিল। এতদিনে সেই দবজাটা চিবদিনের জন্য মুখেব ওপব সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল এবং তাকে গভীর অন্ধকাবেব মধ্যে নিক্ষেপ করলে। সে যে দিকেই তাকাতে চায় সেইদিকেই দেখে চোখেব সামনে গাঢ, জমাট অন্ধকার। হয়ত তাব ছেলেটি এই সহবেই আছে, কিম্বা এই দেশে কিম্বা অন্য সহবে, কিম্বা উত্তব, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ যে কোন একটা দিকের সহবে বা দেশে। পৃথিবীব কোন না কোন অংশে সে নিশ্চয়ই আছে অথচ আব তাব সন্ধান পাওয়া যাবে না। প্রফেসবের মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে তাব সে আশা চূণ হয়ে গিয়েছে। এখন তাকে এ বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গ সন্ধানও কেউ দিতে পারবে না। হাসপাতালে গিয়ে একবাব শেষ চেষ্টা করতেও সে কসুর করেনি কিন্তু কোন ফল হয়নি। এমনকি ফোল্ডানেব মত অমানুষের কাছে যেতেও সে পেছপা হয়নি, কিন্তু সবই বৃথা হয়েছে।

রেগিণা মনে মনে উচ্চাবণ করলে, আর কেন আশাব স্বপ্ন দেখ ? তোমাব বিরুদ্ধে এক ঘোরতর চক্রান্ত গড়ে তোলা

হয়েছে। মানুষ ত ছার, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত সেই চক্রান্তে যোগ দিয়েছেন। ভগবানের দয়া থাকলে কি আর তোমার মত একজন অসহায় স্ত্রীলোককে বিপদের পর বিপদ পাঠিয়ে বার বার পর্যুদস্ত করতে চাইতেন তিনি? অত্যাচারী লোকের হাতেই ক্ষমতা থাকে আর সেই লোক নির্দোষীকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে সবদাই সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে থাকে। তোমাকে অত্যাচারীর যূপকাষ্ঠে বলি হতে হবে—তা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু এইভাবে কতকাল আর দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে অহোরাত্র লড়াই করে মরবে?

রেগিণার মনে হল সেই মুহূর্তে তার ধমনীতে প্রবহমান রক্তস্রোত যেন জমাট বেঁধে গেছে। অস্থির হয়ে সে উঠে বসল। জানালার দিকে চাইতেই এক ঝলক বাইরের আলো এসে মুখের ওপর পড়ল।

কাঁপতে কাঁপতে রেগিণা মনে মনে বললে, 'আজ থেকে আর কান্না নয়, প্রার্থনাও নয়—কারণ এতদিন সবকিছু আমাকে উপহাসই করে এসেছে। আর ঈশ্বর? ঈশ্বর হয়ত আমাকে চরম শাস্তি দিতে পারেন, আমাকে নরকে নিক্ষেপ করতে পারেন এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি জোর গলায় বলব তিনি আমাকে অন্যায় করে এক নিরস, বিষাদময় জীবনের অধিকারীনি করেছেন। হয়ত ভবিষ্যতের জন্যে আরও দুর্বিসহ যাতনা ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। এখন থেকে আশা, বিশ্বাস ও ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিলাম। যে

উপায়েই হোক, যেমন করেই হোক, ছেলেকে আমি খুঁজে বার করবই করব, করব। যারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের ওপরে আমি প্রতিশোধ নোব।'

এই প্রতিজ্ঞা করার পর তার মন অনেকখানি শান্ত হল। মনে পড়ল বহুদিন তার ভাগ্যে আহার ও ঘুম জোটেনি। তার ব্যাগে কতকগুলি স্যাণ্ডউইচ ছিল। স্থইডেন থেকে আনা সেই সব খাবারগুলোর কথা মনেও পড়েনি একবার। সেগুলি বার করে দেখলে রুটিগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সেই শুকনো রুটির দলা কোনও রকমে গিলে সে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে বললে, বৃথা চিন্তা আর চোখের জল অনেক হয়েছে, আর নয়। এইবার কিছুক্ষণ ঘুমোনর দরকার— নইলে আমি ঠিক পাগল হয়ে যাব।

যখন সত্যি সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়ল তখন রাত চারটে।

বেগিণার যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে এবং ঘরের ভেতর কড়া রোদ ঢুকে পড়েছে। তখনও তার ঘুমের আমেজ সম্পূর্ণ কাটেনি। সুতরাং পাশ ফিরে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আরও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে উঠে, খানিকটা কফি খেয়ে নিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে সে পুনরায় চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেল। এইবার তার কোন একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন হয়েছে। সে অনুভব করলে যে এই পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা এবং কারও মতামতের সে তোয়াক্কা

রাখে না। এখন সে বোকার মত যা খুসী তাই করতে পারে, বাধা দেবার কেউ নেই।

এখন তার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন স্থির মস্তিষ্কে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করার। আর কোন ভুল-ভ্রান্তি নয়। সে যেন অচেনা অন্ধকার পথে হাতড়ে হাতড়ে চলেছে, হোঁচট খেলে আর রক্ষা নেই—অবধারিত মৃত্যু। দূরে, অতি দূরে সে একটা আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পাচ্ছে, সেইদিকপানে সে এগিয়ে যেতে চায়। হয়ত সময় লাগবে, হয়ত আঁকা-বাঁকা পথে চলতে হবে, হয়ত হতাশা আসবে এবং ভুল হবে, তবুও গন্তব্যস্থানে তাকে পৌঁছতেই হবে। লক্ষ্যে পৌঁছবার অনেকগুলি পথ আছে—যথা ভিক্ষা করা, লোক ঠকান, আরও কত কি। কিন্তু যে পথেই চলুক না কেন সবক্ষেত্রেই প্রধান প্রয়োজন যে বস্তুটির—তার নাম টাকা। আর সেই বস্তুটিরই তার একান্ত অভাব। মাত্র দু' একশ ক্রোনার পুঁজি! কিন্তু সে আর ক'দিন? লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তাকে দিনের পর দিন দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে এবং তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে। কোন একটা সন্ধানের ছায়া পেলে মাসের পর মাস ছুটে বেড়াতে হবে তার পেছনে। সামান্য যা সঞ্চয় আছে তার ওপর নির্ভর করে থাকলে শীঘ্রি তাকে কপর্দকহীন হয়ে, পুনরায় নূতন অবমাননায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে দিন অতিবাহিত করতে হবে। না, তা' সে কোন মতেই পারবে না।

রেগিণা মনে মনে তোলপাড় করে ভাবতে লাগল কি উপায়ে প্রচুর অর্থ হস্তগত করা যায়। হঠাৎ তার হের ক্যাটেনের কথা মনে পড়ে গেল। সে উৎফুল্ল হয়ে ভাবলে, ওই একটা উপায় বটে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রেগিণা অস্থিরভাবে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে অন্যতর কোন উপায় আছে কি না চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু কোন উপায় তার মাথায় এল না। এক সমুদ্রে ডুবে মরা। কিন্তু সে তো কাপুরুষের মনোবৃত্তি, জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মনোবৃত্তি। রেগিণার সেটা ঠিক পছন্দ হল না। সেই দৃশ্যমান ক্ষীণ আলোকরেখাটি বোধ হয় আলোই নয়, আলোক-ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু সেইদিকে অনেকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেবে ভেবে শেষে তাকেই এক প্রোজ্জ্বল আলোকশিখা বলে রেগিণার ধারণা হ'ল।

রেগিণা মন স্থির করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি উঠে, জামাকাপড় বদলে সে ক্যাটেনকে চিঠি লিখতে বসল। লিখলে, তাকে ছেড়ে এসে সে ভুল করেছে। তার অতীত সহৃদয় ব্যবহার ও দয়ার কথা স্মরণ করে সে তার কাছে ফিরে যেতে চায়। তিনি যেন দয়া করে স্থান দেন।

হঠাৎ সে চমকে কলম থামিয়ে ভাবলে, এ আমি কি করছি? এ ছাড়া সত্যিই কি আর উপায়ান্তর নেই? তার অবচেতন মন থেকে কে যেন ঠাট্টা করে বলে উঠল, আছে বই'কি। বাকী আছে সমুদ্রে ডুবে মরা।

আবার রেগিণা লিখতে সুরু করলে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার আপনা থেকেই কলম থেমে গেল। সে ভাবলে, সে ভদ্রলোক ত আমার কোন অপকার করেন নি, সুতরাং তাঁকে এ ভাবে ব্যবহার করা কি উচিত হবে? কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবলে, আমিই বা কার কি অপকার করেছি যে সবাই মিলে আমাকে তাদেব ইচ্ছেমত কাজে লাগাতে চায়! প্রথমে ফোল্ডন! নিজের গ্রীষ্মাবকাশকে মধুর করবার জন্যে সে আমাকে কাজে লাগালে। সে কি জানত না যে তার ব্যবহারে একটি কোমল নারী-হৃদয় চিবদিনের জন্য ভেঙ্গে যাবে? জেনে-শুনে সে আমাকে কাজে লাগালে। আর ভগবানের এমনই লীলা যে আজ সেই কিনা পবম নির্ভরশীল, পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করছে।...তারপর হাসপাতাল! সেখানকার প্রতিটি লোক আমাকে যদেচ্ছ নেড়ে-চেড়ে তাদেব শিক্ষার কাজে লাগালে। আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করলে না।...এমন কি ভগবান পর্যন্ত আমাকে তাঁব কাজে লাগাতে কসুর করলেন না। কত কাঁদলাম, কত প্রার্থনা করলাম, কিন্তু তিনি এই অভাগীনি নারীর আর্ত ক্রন্দনে কর্ণপাত মাত্র করলেন না। অপুত্রক কোন এক দম্পতীর একটি ছেলের দরকার, তাঁরা আমার ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে তাঁদের কাজে লাগালেন। আমার হৃদয় ভাঙ্গবে তাতে তাঁদের কি? রেগিণা যে স্বেচ্ছায় ছেলেটিকে দত্তক দিয়েছে এ কথা বেমালুম ভুলেই গেল।

ক্রোধের আবেগে রেগিণা দ্রুত পাঁয়চারি করতে লাগল। সে প্রমাণ করতে চায় যে সে স্বেচ্ছায় ছেলেকে বিলিয়ে দেয়নি। সে ভাবলে, মানুষের দুরাদৃষ্ট অন্তরালে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা করে। যখন প্রতিপক্ষকে সে দুর্বল ও অসহায় বুঝতে পারে তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হৃদয়ের ধন কেড়ে নেয়। তারপর যখন সে সেটি ফিরে পেতে ব্যাকুল হয় তখন সুদখোর মহাজনের মত তমসুকখানা বার করে দিয়ে আইন ও সত্ত্বের কথা তুলে হুমকি দিয়ে বলে, 'এই খৎখানা কি তুমি নিজের হাতে লিখে দাওনি ? '

অবশেষে অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পর রেগিণা যখন চিঠিখানা লিখে শেষ করলে তখন তার মনের উষ্মা অনেক কমে এসেছে। সে অনুভব করলে, এইবার সে সেই শীর্ণ আলোক রেখাটির দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন তার পক্ষে কোন অবস্থাতেই ফিরে দাঁড়ান অসম্ভব।

তেরো

হের ফ্ল্যাটেনের গৃহে আজ এক বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে। আহারাদির পর নিমন্ত্রিতেরা যে যার বাড়ী চলে গেলেন। চলমান গাড়ীগুলির সুস্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি দুরুহ শীতের রাত্রে সেই নিঃস্তব্ধ উপত্যকাভূমিকে কিছুক্ষণের জন্য মুখরিত করে রাখলো। অবশেষে গাড়ীর আলোগুলি ক্রমশঃ গভীর অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

উঁচু উঁচু পাইন গাছে ঘেরা সেই বৃহৎ অট্টালিকার উভয় তলার জানালায় জানালায় কিছুক্ষণের জন্য ভ্রাম্যমান আলোক-বর্তিকাগুলি চলাফেরা করতে লাগল। সেগুলিও ক্রমশঃ নিভে গেল। সারা বাড়ীটিতে তখন একটি মাত্র জানালা আলোকিত হয়ে রইল। বাকী সমস্ত বাড়ীটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল।

হের ফ্ল্যাটেন গোটা বাড়ীটা একবার তদারক করে শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। সারা সন্ধ্যাব্যাপী নৃত্য ও মদিরার আবেশে তিনি বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের ভেতর এসে তিনি একবার রেগিণার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রেগিণা সাদা নৈশসজ্জা পরে সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট টানছিল। বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। চোখদুটি যেন এক বিশেষ ভাবাবেশে চক্‌চক্‌ করছে। সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাটেনের মনে হ'ল রেগিণা পরমা সুন্দরীই বটে। গাঢ়স্বরে ফ্ল্যাটেন বললেন, "আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানটি বেশ নির্বিঘ্নেই চুকে গেল, কি বল?"

সিগারেটে একটা টান দিয়ে রেগিণা উত্তর দিলে, "নিমন্ত্রিতেরা লোক সবাই নেহাৎ মন্দ নয়।"

ফ্ল্যাটেন ড্রেসিং গাউন ছেড়ে খাটের কিনারায় বসে পড়ে এক বিশেষ ধরণে চাইলেন রেগিণার দিকে। রেগিণা সে দৃষ্টি লক্ষ্য না করবার ভাণ করে ধূমপান করেই চলল।

একটু ম্লান হাসি হেসে ফ্ল্যাটেন খোসামুদির সুরে বললেন, "তুমি যে অত সুন্দর নাচতে পার তা' ত কোন দিন বলনি আমাকে।"

"নাচ কিন্তু আমি তেমন করে কোন দিনই শিখিনি।"

শিশুর মত সরল হাস্যে সমস্ত মুখখানা খুসীর উচ্ছ্বাসে ভরে তুলে ফ্ল্যাটেন বললেন, "ওঁরা সবাই তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন, বিশেষ করে তোমার পোষাকটা ওঁদের খুবই ভাল লেগেছে।"

"কিন্তু মহিলারা যা বলাবলি করছিলেন তা ত শোন নি।"

দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে ফ্ল্যাটেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলছিলেন তাঁরা?"

"তা' তোমার শুনে কাজ নেই। সেই সব দুর্মুখ মন্তব্য আমার কিন্তু চিরদিন মনে থাকবে।"

ফ্ল্যাটেন বিছানার ওপর উঠে বসে জামা ছেড়ে বললেন, "তুমি কি শোবে না এখন?"

বাইরে তখন ক্রুদ্ধ বাতাস শন্‌ শন্‌ করে বইছে আর তুষারের পাপরিগুলি জানালার কাঁচের ওপর আছড়ে পড়তে সুরু করেছে।

কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটির ওপর এক অখণ্ড নিঃস্তব্ধতা নেমে এল। রেগিণা ফ্ল্যাটেনের দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি কথা দাও, আজ যারা আমাকে অপমান করেছে তাদের তুমি দস্তুরমত শিক্ষা দেবে?"

মৃদু ভৎসনার সুরে ফ্ল্যাটেন উত্তর দিলেন, "কেন বলত! এ কথা বলছ কেন? এত রাত্রে এ প্রশ্নের মীমাংসা কি না করলেই নয়?"

রেগিণা কিছুক্ষণের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্ল্যাটেন শান্ত হবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দেখে মনে হ'ল তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। রেগিণা বৃদ্ধের এই চাঞ্চল্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মনে মনে না হেসে পারল না। ভাবলে, আজ না হ'ক একদিন না একদিন ওঁর কাছে ধরা দিতেই হবে—বেশীদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

পাঁচমাস হ'ল তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু এই পাঁচমাসে এখনও তারা যথেষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারল না। ফ্ল্যাটেন যতই কাছে এগিয়ে আসতে চান, রেগিণা ততই পিছ্‌লে পিছ্‌লে নাগালের বাইরে চলে যায়। দু'মাসের জন্যে তারা গিয়েছিল মধুচন্দ্র যাপন করতে। তখন রেগিণা ভাবলে, আগে তো বাড়ী ফিরে যাই, তারপর দেখা যাবে। যখন সত্যিই বাড়ী ফিরে এল তখন ভাবলে, আরও কিছুদিন যাক্, আগে বাড়ী-ঘর-দোর একটু সামলে নি। অবশ্য সে স্বীকার করতে বাধ্য

হ'ল যে ফ্ল্যাটেন তার সঙ্গে খব মধুব ও অমায়িক ব্যবহার করছেন। ঠাণ্ডা থেকে আগুনের উত্তাপে এলে যেমন আরাম বোধ হয় ফ্ল্যাটেনের সাহচর্যও তেমনি দিন দিন কাম্যতর বোধ হতে লাগল। রেগিণা ভাবলে, এতদিনে সে এমন একটি লোকের সাহচর্য পেয়েছে যিনি তাকে সত্যিই কামনা করেন। এ তাব কাছে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। ক্রমশঃ রেগিণার প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে এল। ফ্ল্যাটেনকে সুখী দেখবার জন্যে সে তার সমস্ত দুষ্টুবুদ্ধি পরিত্যাগ করলে। এতদিন সে যে নানা অছিলায় ফ্ল্যাটেনকে দূরে ঠেলে রেখেছে এ কথা স্মরণ করে সে নিজেকে শত ধিক্কার দিতে লাগল। কিন্তু তবুও সে ফ্ল্যাটেনকে দূরেই সরিয়ে রাখলে। এই নিষ্ঠুর খেলায় সে আমোদ অনুভব করতে লাগল। সে ভেবে দেখলে আর বেশী দিন নয়,—বন্য বিহঙ্গমীর ধরা দেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে!

একদিন ফ্ল্যাটেন বিরক্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ব্যাপার কি বলত! চিরদিনই কি তুমি এমনি দূবে দূরেই থাকবে?"

রেগিণা ভাবলে, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! কিন্তু তবুও সে সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে খুবই নির্লিপ্ত থাকবার ভাণ করে বললে, "একটি কথা তুমি কিন্তু আমাকে আজও পর্যন্ত বলনি।"

ঘুমের আবেশে জড়িত কণ্ঠে ফ্ল্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথা প্রিয়তমে?"

"কি ভাবে তুমি আমার প্রথম খোঁজ পেলে?" এই কথা জিজ্ঞাসা করেই বেগিণা ক্রমাগত ধূমপান করতে লাগল। সে যেন সাংঘাতিক কিছু একটা উত্তর প্রত্যাশা কবছে। সে চোখ বুঁজে নিঃসারে পড়ে রইল, যদিচ সে পবম আগ্রহে ফ্ল্যাটেনের প্রতিটি মুখ-ভঙ্গিমা অনুধাবন কববাব চেষ্টা কবতে লাগল।

"সে কথা তো তোমাকে আজ পর্যন্ত না হো'ক হাজাব বাব বলেছি।'

"কই আব বললে! কেন বলত সব কথা তুমি আমাব কাছে গোপন কবতে চাও?"

"কি আবাব গোপন করলাম তোমাব কাছে? প্রফেসব গ্রেগাব্‌সনকে আমি লিখেছিলাম একজন নরউইজিয়ান হাউস কিপাব ঠিক করে দেবাব কথা। ব্যস্—তাব পবেই—"

"কিন্তু এত লোক থাকতে তাঁকেই বা এ অনুবোধ কবতে গেলে কেন?"

গভীব আগ্রহে রেগিণা চোখ খুলে ফ্ল্যাটেনেব মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যদিচ সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন শুধু হাসবাব জন্যেই সে চোখ মেলে তাকিয়েছে।

কিঞ্চিৎ বিরক্তস্বরে ফ্ল্যাটেন উত্তর দিলেন, "শোন কথা। আমরা যে এক দেশেরই লোক—তা' ছাড়া প্রফেসর আর আমি বাল্যবন্ধু। সেই সুবাদে আমি যদি তাঁকে কোন একটা

চিঠিতে এমনি একটা অনুরোধ ক'রে থাকি, তা' হলে অস্বাভাবিক কি হয়েছে শুনি ?” তার পর খুবই বিরক্তভাবে বললেন, “কিন্তু তুমি কি আজ আর শোবেই না ঠিক করেছ ?”

রেগিণা সিগারেটের শেষাংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগে তার সর্ব অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল কিন্তু কষ্টে সে ভাব দমন করবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে সে ছাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যেন অবাক্ হয়ে গেছে এমনিভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, “আচ্ছা, প্রসূতিভবনের ডাক্তারদের সঙ্গে কতো রকমের মেয়েরই তো আলাপ থাকে, তা জানত ?”

“তা থাকাই তো স্বাভাবিক।”

“ধর যদি তাদেরই কাউকে পাঠিয়ে দিতেন তিনি ?”

হাই তুলে ফ্ল্যাটেন বললেন “এত আজগুবি চিন্তাও তোমার মাথায় আসে ?”

রেগিণা অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। না, সত্যিই তাহলে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু শেষ সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে সে উঠে গিয়ে খাটের ধারে বসে পড়ল। তারপর ফ্ল্যাটেনের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্ল্যাটেন স্নেহভরে তাকে আরও কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করলেন কিন্তু রেগিণা প্রতিরোধ করে বললে, “তোমার মত স্বামী পেয়েছি বলে নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছে।”

"সত্যি নাকি ?"

"সত্যি বলছি। আমাকে নিয়ে তোমার অযথা কৌতূহল নেই, এমন কি আমার বিগত জীবন সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে চাওনা তুমি।"

এ কথায় ফ্ল্যাটেনের মুখে যেন বিষাদের ছায়া নেমে এল। রেগিণাব চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ম্লান হেসে তিনি বললেন, "তার জন্যে আর তাড়াতাড়ি কি! লক্ষ্য করেছি নিজের থেকে তুমি বিশেষ কিছু বলতে চাও না। অবশ্য তোমাকে যতটুকু পেয়েছি তাতেই আমি খুসী। তার বেশী পাবার আমার লোভ নেই। একদিন যখন আমরা পরস্পরকে আরও ঘনিষ্টভাবে জানবার অবসর পাব, সেদিন আর আমাদের কিছুই অজানা থাকবে না।"

পরিপূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে ফ্ল্যাটেন রেগিণার দিকে চেয়ে রইলেন। রেগিণার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে গেল। এক উদ্গত অশ্রুর প্রবাহ তার কণ্ঠ রোধ করে ফেললে। কিন্তু সে সাবধানে পূর্বপরিকল্পিত পথে এগিয়ে চলল।

"ক্রিষ্টানস্যাণ্ডে তোমার যে অনূঢ়া বোন আছেন তাঁর কিন্তু একটি পোষ্যপুত্র নেওয়া একান্ত উচিত—নিঃসঙ্গ কুমারী জীবনের ভার কতই না দুঃসহ।"

আবার সে তীক্ষ্ণ, তির্যক দৃষ্টিতে ফ্ল্যাটেনের মুখের প্রতিটি রেখা পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এবার গ্রীষ্মকালে যখন নরওয়ে যাব তখন তোমার বোনের সঙ্গে আলাপ করে আসব, কি বল!"

"তা'হলে সত্যিই সে ভাবী খুসী হবে। পোষ্যপুত্রের ব্যাপারটা সেই সময় উত্থাপন কোরো না হয়।"

এই কথা বলে ফ্ল্যাটেন হেসে উঠলেন। তাঁর নির্মল প্রাণখোলা হাসিতে রেগিণা অনেকটা আশ্বস্ত হ'ল। তা'হলে তিনি তার সম্বন্ধে সত্যিই কিছু জানেন না এবং এতদিন ধরে সে যে সমস্ত সন্দেহ পোষণ করে আসছিল সেগুলো ভিত্তিহীন।

রেগিণা পোষাক ছেড়ে বিছানায় শুতে গিয়ে দেখল ফ্ল্যাটেন অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর ঘুমন্ত মাংসল মুখের দিকে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আহা, বেচারী সারা সন্ধ্যাবেলাটা নেচে নেচে সত্যিই কাবু হয়ে পড়েছেন।... যাক্ এতদিনে তার সমস্ত সন্দেহের অবসান হ'ল। কত কিছুই না সে এতদিন ভেবে মরছিল– কত অনর্থক হাস্যকর সন্দেহ!...বিবাহ-রাত্রে তারা উভয়ে যখন অল্‌টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রেগিণার তখন এ ভেবে খুবই আনন্দ হচ্ছিল যে বোধ হয় এতদিন পরে তার জীবনের অখণ্ড দুর্দশা থেকে সে চিরতরে মুক্তি পেলে। কিন্তু এখন তার মনে হতে লাগল যে সে ভুল করেছে। একমাত্র অর্থ ছাড়া ফ্ল্যাটেনের কাছ থেকে অন্য কিছু আশা করা যায় না।

বাতিদান থেকে একফালি শীর্ণ নীলাভা ফ্ল্যাটেনের মুখের ওপর পড়েছে। রেগিণা সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইল। ভাবলে, মনের বিভ্রান্ত অবস্থায় যে পথ সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে, সেটা কি ভুল পথ? যে আশায় সে বৃদ্ধ ফ্ল্যাটেনের শয্যাসঙ্গিনী হ'তে স্বীকৃতা হয়েছে, সে আশা তবে কি ব্যর্থ হবে? হয়ত এই লোকটির আদরে ও সোহাগে সে তার সমস্ত পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে, এই সহজ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। যাঁরা তাঁব সন্তানকে কেড়ে নিয়েছেন, এটা তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন। হয়ত এই বিবাহ তাঁদেরই পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্তের একটা ধাপ মাত্র। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁদের চালে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি।

তার অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এ কথা একশবার সত্যি, নইলে তুমি তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে এমনি ভাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দাও? সামান্য আদরে গলে গিয়ে তোমাব অতীত গ্লানিকব জীবনেব কথা ভুলে যাও? তাঁদের কিছুমাত্র ভুল হয়নি। সত্যিই তুমি পৃথিবীব এক ঘৃণ্যতম জীব।

বাইরের নৈশ স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ কবে শীতেব হিমেল বাতাস তখন যেন ক্রুদ্ধ গর্জনে মাতামাতি সুরু কবে দিয়েছে।

চৌদ্দ

রেগিণা যখন ফ্ল্যাটেনকে বিয়ে করতে মত দেয় তখন সে অতটা খুঁটিয়ে দেখেনি যে পরে কি করে সে এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবে। এখন এইটেই তার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যদি ছেলেকে খুঁজে বের করতে হয় এবং ছলনার মুখোস ছিঁড়ে ফেলে সম্মানজনক জীবনযাত্রা স্বুরু করতে হয় তা'হলে নিজেকে মুক্ত করার যে কোন একটা সহজ পথ তাকে যত শীঘ্র সম্ভব বের করতেই হবে। স্বামীকে আব মুক্তিদাতা মনে করবার কোন কাবণ নেই। ববং তিনি এখন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এক প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দিন দিন তিনি তাকে এক অচ্ছেদ্য স্নেহ-পাশে জড়িয়ে ফেলছেন। সেই নাগ-পাশ থেকে মুক্তি পাওয়াই এখন তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

যতক্ষণ ফ্ল্যাটেন অফিসে থাকেন ততক্ষণ রেগিণা শ্রান্তেব উন্মনা মধ্যাহ্নে একাকী উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সেই বৃহৎ অট্টালিকাব ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। কোন কাজ তাব ভাল লাগে না, কেন না কাজ করতে গেলেই বেশী করে মনে পড়ে যায় যে সে বিবাহিতা। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন রেগিণা প্রতিমুহূর্তেই ফ্ল্যাটেনের প্রত্যাবর্তন আশঙ্কা করে। যতই তাঁর ফিরে আসার সময় এগিয়ে আসে ততই সে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। এখন সে ফ্ল্যাটেনের স্নেহের অত্যাচারকেই ভয় করে বেশী, কেন না, সে অনুভব করে যে এই স্নেহাশ্রয়ই তাকে

তাব কর্তব্য ভুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কি ক'রে যে সে এই উৎপাত থেকে অব্যাহতি পাবে তারও কোন সহজ পথ খুঁজে পায় না। এমনি করে দিনেব পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। সে একান্ত নিরুপায়ের মত সেই সময়-প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে চুপটি করে বসে থাকে। তার কেমন যেন মনে হয় অঙ্গুলি-হেলনের মত শক্তি ও কর্মোদ্যমও বুঝি আর অবশিষ্ট নেই।

মাকে সে নিয়মিত চিঠি লেখে বটে কিন্তু সেই সব চিঠিতে যেন প্রাণেব স্পর্শ থাকে না। অত্যন্ত নিবস ও বস্তুতান্ত্রিক পত্রেব ছত্রে ছত্রে দরদ ও প্রীতি-মধুব অভিব্যক্তিব পরিবর্তে সে গুঁজে দেয় গোছা গোছা নোট। মায়ের দিক থেকে জবাব এলে সে সেগুলি না পড়েই পকেটে গুঁজে রেখে দেয়। সপ্তাহেব পর সপ্তাহ ধরে সেই অপঠিত চিঠিগুলি পকেটে পকেটেই ঘোবে। চিঠিগুলি যেন তাকে তার লজ্জা ও সঙ্কোচের কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।

সারা সকাল বেলাটা রেগিণা তার সেই ছোট্ট ঘরটিতে বসে বসে চা আর সিগারেট খেয়ে খেয়েই সময় কাটিয়ে দেয়। অগ্নিকুণ্ডেব রক্তিম আভা রূপোর চা-দানে ও চিনেমাটির বাসনে প্রতিফলিত হতে থাকে। সেই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটি ঘিরে সিগারেটের নীলাভ কুণ্ডলীগুলি ক্রমাগত ওপর দিকে উঠতে থাকে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রেগিণা কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়।

কিন্তু এই নিরুদ্যম ও অলস জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে তার ছেলেটির কথা খুব বেশী করে মনে পড়ে যায়। তারই

বঙ্গীন স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে যায়। ভাবে, সত্যিই যদি সে সন্তানকে ফিবে পায় তা'হলে কি ভাবে তাকে লেখাপড়া শেখাবে, মানুষ কবে তুলবে—এই সব। সে নিজেকে এক আত্ম-তুষ্টা, বৃদ্ধা জননীরূপে কল্পনা করে। চিন্তা কবে, তার ছেলেটি যেন একজন সর্বজনপ্রিয়, গণ্যমান্য লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাবা যেন হু'টিতে দূবে, বহুদূবে মেডিটাবেনিয়ানের ধাবে একটি শান্ত কুটিবে বাস কবছে। ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনটিতে যেন একটি সু-পবিকল্পিত গৃহোদ্যান বয়েছে। সেই বম্য বাগানে তাব প্রিয় ফুলগুলি ফুটে বয়েছে। সন্ধ্যাগমেব সঙ্গে সঙ্গে সেই মায়াকুঞ্জের ওধাবে ঘন সাইপ্রাস-বৃক্ষেব মাথাব ওপবে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। আব তা'বা দুজনে ঝোলা বাবান্দাটিতে ছড়িয়ে বসে স্বদেশেব গান গাইছে।

কখনও সে কল্পনা কবে, সে যেন তাব ছেলেটিব হাত ধবে চার্চে চলেছে। অর্গানেব সু-মধুব সুব-ঝংকাব চাবিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আনন্দের হিল্লোলে তাব হৃদয় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাব জাবনের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ যেন সেই সু-মধুব সুবস্পর্শে একমুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল। মনে হ'ল সে যেন সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীদেব মত নির্মল ও আত্মত্যাগেব জীবন যাপন করছে।

ফ্ল্যাটেন এসে পড়তেই ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। স্বপ্ন কেটে যেতেই জেগে উঠল কঠোব বাস্তবতা। বেগিণা মনে মনে ভাবলে,

আর কতদিন এই ছলনাময় ঘৃণিত জীবনের গুরুভার টেনে বেড়াতে হবে? তার এই অভিশপ্ত নিঃসঙ্গ জীবন কি কোন অংশেই একজন গৃহহারা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের চেয়ে কাম্যতর?

এমনি ভাবে স্বপ্নের ঘোরে ও নিরর্থক চিন্তায় ব্যাপৃত থেকে বেগিণা আলস্যে ও নিরুদ্যমে দিন কাটাতে লাগল। সে আশ্চর্য হ'ল এই দেখে যে এখনও সে যে শুধু এই বাড়ীতে বাস করছে তাই নয়, এখনও সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন নতুন জামা-কাপড়ে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলছে আর নিত্য করছে নব নব অঙ্গরাগ আর প্রসাধন। একবারও ভাবছে না, কি লজ্জাকর গুরু মূল্যে সে এই সব সজ্জাবস্তু ক্রয় করেছে।

এখন থেকে সে ঘুমের জন্যে একটু একটু আফিম খাওয়া ধরলে। সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গার পর সে নিজেকে বড় বেশী দুর্বল বোধ করতে লাগল। দুপুরবেলা পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না। ক্রমশঃ আত্মবিশ্বাসের সমস্ত শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলল। ফ্ল্যাটেন প্রথমটা অতশত লক্ষ্য করেন নি, মনে করেছিলেন যে যুবতী স্ত্রীলোকেরা হয়ত বিশেষ অবস্থায় একটু বেশী রকম ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। ঝোঁকের কারণও তিনি যেন কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছিলেন। তিনি প্রত্যহ সেই আনন্দ-মুহূর্তের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন যখন বেগিণা তাঁর কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলবে, 'ওগো তুমি সন্তানের পিতা হতে চলেছ।'

বেগিণার কিন্তু ফ্ল্যাটেনের আদর ও উচ্ছ্বাস দিন দিন

অসহ্য বোধ হতে লাগল। শয়নকক্ষের চিন্তামাত্রই তার কান্না আসত। কাজের জন্যে ফ্ল্যাটেন যখন মাঝে-মধ্যে গুটেনবার্গ যেতেন তখন রেগিণা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। মনে মনে প্রার্থনা করত এই যাওয়াই যেন তাঁর শেষ যাওয়া হয়। চোখ বন্ধ করে নিজের সেই মুক্ত অবস্থা কল্পনা করতে ভারী ভাল লাগত তার। ভাবত, যদি তেমন কিছু ঘটে তা'হলে তার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সে তার বিলিয়ে দেওয়া ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে আর এখনকার সব কিছু বন্ধন কাটিয়ে উঠে নূতনভাবে জীবন সুরু করতে পারবে।

ফ্ল্যাটেন কিন্তু সেবারে হাসতে হাসতে অক্ষত অবস্থায় বাড়ী ফিরে এলেন। দু'জনের প্রথম দেখা হতেই দুই ব্যগ্র বাহু মেলে ফ্ল্যাটেন রেগিণাকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এই কৃতবিদ্‌ এবং বুদ্ধিমান বৃদ্ধটি তাঁর তরুণী ভার্যার সম্মুখে এলেই কেমন যেন নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলতেন। উপহারের পর উপহার দিয়ে তার তরুণ চিত্ত জয় করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। এতে রেগিণার অপমান বোধ করত। মনে হত এই বিভিন্ন উপহারের ডালি তাকে নতুন করে স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা করছে। বাইরে অবশ্য সে এই অসন্তোষ যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করত। সুতরাং সেই সব দামী দামী উপহার সে হাসিমুখেই গ্রহণ করত, পাছে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে চোখের জলে আসল কথাটাই ধরা পড়ে যায়।

একদিন অফিস যাবাব পূর্বে ফ্ল্যাটেন বেগিণার খাটের ওপর বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার বলত ? আমাব যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে !"

রেগিণাব মাথাব মধ্যে দিয়ে অকস্মাৎ তবিৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। সে ভাবল, তাহলে স্বপ্নেব ঘোবে সে কি কোন কথা ফাঁস করে দিয়েছে ?

ফ্ল্যাটেন ঝুঁকে পড়ে, তার কাণের কাছে মুখ নামিয়ে ধবলেন, বললেন, "তোমার কি ছেলে-পুলে হবে ?"

এক শ্লেষপূর্ণ হাসির দমকে বেগিণা ফেটে পড়ল। তাই বটে, তা'হলেই ষোলকলা পূর্ণ হয় বটে !

তাব মাথায় এক দুষ্টুবুদ্ধি এল, ভাবলে ঠিক হয়েছে, ওঁকে একটু বোকা বানান দবকার। সে জোর করে খানিকটা হাসি টেনে এনে বললে, "তোমার চোখে কি কিছুই এড়ায় না ?"

ফ্ল্যাটেন এমন কবে বেগিণাকে জড়িয়ে ধরলেন যে তার দম বন্ধ হবার জোগাড়। তারপব তিনি প্রায় নাচতে নাচতে ঘব থেকে বেড়িয়ে গেলেন। তখন থেকে তিনি সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। যে ভবিষ্যৎ বংশধব আসছে তার জন্য প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে যেতে চান তিনি।

সেইদিন থেকে ফ্ল্যাটেন সময়ে-অসময়ে এই আনন্দ সংবাদটি যত্র তত্র বলে বেড়াতে লাগলেন। রেগিণার সমাদরও যেন সেই অনুপাতে বেড়ে গেল। রেগিণার কিন্তু একবারও ইচ্ছা হ'লনা সত্য কথাটা ফাঁস কবে দিয়ে ফ্ল্যাটেনের এই স্বতঃস্ফূর্ত

উচ্ছ্বাসে বাধা দেয়। তা' ছাড়া ফ্ল্যাটেনকে বোকা বানিয়ে সে বেশ আমোদ বোধ করতে লাগল। একদিন না একদিন সত্য অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে, কিন্তু ততদিনে তাকে একটা কিছু পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

রেগিণা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ক্রমশঃ নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। যতই তার মন দমে যেতে লাগল, ততই সে তার সন্তানের চিন্তাকে বেশী করে আঁকড়ে ধরলে। সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার শিশুটি অসুখে কাতরাচ্ছে, অথচ সেবা করবার জন্যে কেউ ছুটে আসছে না। শিশুটিকে স্পষ্ট যেন সে চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছে, এমন কি তার গলার স্বব পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে। শিশুটি তাব কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে দুটি ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু সে এত দূরে রয়েছে যে অতদূব থেকে তাব নাগাল পাচ্ছে না।

এমনি বিচিত্র চিন্তার মধ্যে একদিন বড়দিন এসে গেল। তুষারাচ্ছাদনে মাঠ গেল ঢেকে। গাছের চিক্‌চিকে পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যকিরণ পিছলে পড়তে লাগল। বহুদূরেব নীচু উপত্যকাভূমি দিয়ে মাঝে মাঝে এক-আধটা ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে ছুটে চলেছে। তুষার পতনের ফলে গাছেব ডালগুলিকে সাদাটে দেখাচ্ছে। গাছগুলিও ঈষৎ অবনত হয়ে পড়েছে। এখন বাইরের লোকজনের যাতায়াত কমে এসেছে কারণ ফ্রু ফ্ল্যাটেন বড় একটা কাকেও নেমতন্ন করেন না, নিজেও

কারুর বাড়ী যান না। দিনগুলি যেন একঘেয়ে ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। ফ্ল্যাটেন অধিক রাত্রি পর্যন্ত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কারণ পূর্বের মত সকাল-সকাল বাড়ী ফিরে আসার উন্মাদনা আজকাল আর তেমন অনুভব করেন না।

রোজ সকালে রেগিণা ঘুম থেকে উঠে প্রতিজ্ঞা করে, আজ যেমন করেই হোক একটা হেস্ত-নেস্ত করবে, কিন্তু কি করবে ভেবে পায় না। সে কি এখান থেকে চলে যাবে? তাহলে তো পূর্বের মতই দুরবস্থা হবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করতে পারে বটে কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অমন একটি জটিল ব্যবস্থা তার মনঃপুত হ'ল না।

মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, তার স্বামীর আর্থে আর বোধ হয় তার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তা' হলে ত ঘটনাপুঞ্জের পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। সে ভেবে দেখলে বারে বারে পেছন ফিরে না তাকিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়াই এখন তার একমাত্র কর্তব্য।

কতো দিন সে ভেবেছে কত না বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মৃত্যু ঘটান যেতে পারে। সে এ বিষয়ে এত বেশী চিন্তা করেছে যে এ চিন্তা আর তার কাছে ভয়াবহ বলে মনে হয় না। তার মনে হল, নিত্য নতুন অপরাধ করার চেয়ে একবার একটা নৃশংস অপরাধ করাও ঢের ভালো, অবশ্য তাতে যদি অভীপ্সিত বস্তুটিকে লাভ করা যায়।

একদিন হঠাৎ রেগিণার নজরে পড়ল ফ্ল্যাটেন তাঁর প্রথমা পত্নীর ছবিটির নীচে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে

আছেন। সেই মুহূর্তে তাঁর অভিপ্রায় যেন সুস্পষ্ট অক্ষরে তাঁর মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে। রেগিণা ব্যাঙ্গের হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে বৃদ্ধ যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। কি একটা অপরাধ করতে গিয়ে তিনি যেন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছেন। রেগিণা লক্ষ্য করলে, এই ক'দিনে ফ্ল্যাটেনের চোখ-মুখ অসম্ভব রকম বসে গেছে। মোটা-সোটা লোকটাকে এখন অসম্ভব ম্লান ও দুর্বল দেখাচ্ছে। তিনি যেন হঠাৎ বেশ বুড়িয়ে গেছেন। এক মুহূর্তের জন্য রেগিণার ভারী কষ্ট হ'ল তাঁকে দেখে। মনে হ'ল অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও তাঁর সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ও সহৃদয় ব্যবহার করা উচিৎ।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রেগিণা টের পেলে যে সে পুনরায় সন্তানের জননী হতে চলেছে। এই সম্ভাবনার কথা কোনও দিনও সে মনের কোণে ঠাই দেয়নি। বেশ কয়েক দিন সে মনমরা হয়ে রইল। কোন এক অদৃশ্যবর্তী শত্রু যেন অকস্মাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে তাকে কাবু করে ফেলেছে। যদিও সে একজন ভ্রষ্টা ও বিপথগামিনী স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নয় তবুও এতদিন পর্যন্ত মাতৃত্ব তার কাছে একটি পবিত্র ও নিষ্কলুষ অনুভূতি ছিল সন্তানের চিন্তামাত্র তার মনে হ'ত সে যেন একটি ছোট্ট মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ?···

আজ যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে সে প্রতিনিয়ত চাতুরী করেছে, ছলনা করেছে এবং যাঁকে হত্যা পর্যন্ত করতে সে কুণ্ঠিত নয়,

সেই কিনা তাকে বাধ্য করছে আরও একটি ফ্ল্যাটেন বংশধরকে এই পৃথিবীতে আনতে। কে বলতে পারে, এই বালকই একদিন উত্তরকালে তার পিতার প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে চাইবে কি না? হয়ত এই শিশুটিই একদিন তার মাতৃত্বের ঋণ ভুলে গিয়ে, তার নিজের সন্তানের একমাত্র প্রতিবন্ধকরূপে তাকে চিরকালের জন্য ফ্ল্যাটেন-পরিবারের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনে বেঁধে ফেলবে!

বেগিণা বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তার শেষ উত্তাপটুকু পর্যন্ত কে যেন বরফ ঘসে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। এক অব্যক্ত ঘৃণার ঢেউ যেন সর্পাঘাতে বিষক্রিয়ার মত তার সর্বাঙ্গ বেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল।

পনেরো

রেগিণা যখন নীচে নেমে এল তখন তার শুকনো ও ফ্যাকাশে মুখ দেখে মনে হ'ল যেন সারারাত তার ঘুম হয়নি। ইতিমধ্যে সে মন স্থির করে ফেলেছে। সারা সকালবেলাটা সে চিন্তাক্লিষ্ট মনে, এঘর-ওঘর ক'রে কাটিয়ে দিলে।

দুপুরে খাবার টেবিলে তাকে পূর্বের মতই প্রফুল্ল বলে মনে হ'ল। ফ্ল্যাটেনও প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। খেতে খেতে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। রেগিণা হঠাৎ একসময় নিশ্চুপ হয়ে ফ্ল্যাটেনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। এটা ফ্ল্যাটেনের দৃষ্টি এড়াল না। প্রতিমুহূর্তেই তিনি আশঙ্কা করতে লাগলেন এইবার বুঝি রেগিণা বেয়াদপ কথা একটা কিছু বলে বসে!

কিছুক্ষণ পর রেগিণা মৌন ভঙ্গ করে হঠাৎ বলে বসল, "আজ তোমাকে এমন একটা খবর শোনাব যা' তোমার কল্পনারও বাইরে।"

"কি এমন কথা?"

"তোমার এখানে আসবার আগে আমার একটি খোকা হয়েছিল।"

রেগিণা অত্যন্ত সহজভাবে এই কথা কটি বলে গেল। এমন কি তাঁর ঠোঁটের কোণে এতক্ষণ যে মৃদু হাসিটি লেগেছিল, সেটারও কোন বিকৃতি ঘটল না। ফ্ল্যাটেনের হাত থেকে চামচে খসে পড়ল। তাঁর মুখখানা মুহূর্তে ছাই-এর মত বিবর্ণ ও

সাদাটে হযে গেল। অনেকক্ষণ পব বেগিণাব দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেযে তিনি অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে যেন স্বগত উচ্চাবণ কবলেন, "বল কি।" তারপব যেন মস্ত একটা মজাব কথা শুনেছেন এমনিভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে হেসে বার বাব সেই এক কথাই উচ্চাবণ কবতে লাগলেন।

বেগিণা শান্তস্বরে পুনবাবৃত্তি কবে বললে, "বিযেব আগে আমাব একটি ছেলে হযেছিল।"

হতচকিত ভাবে বেগিণাব মুখেব দিকে অনেকক্ষণ এ-দৃষ্টে তাকিযে রইলেন ফ্ল্যাটেন। এ বকম ভাবে বহুক্ষণ তাকিযে থাকতে থাকতে তাঁব যেন সন্দেহ হ'ল, ঠাট্টা নয -বেগিণা রূঢ সত্যি কথাই বলেছে। তাঁব মনে হ'ল, এইবাব বুঝি জ্ঞান হাবিযে তিনি মেঝেতে লুটিযে পডবেন। রেগিণাকে তিনি যেন আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। সে যেন দূরে, অতিদূবে, দৃষ্টিব অতীত স্তবে সবে গেছে।

বহুক্ষণ ধবে উভযেই নীববে, নতমুখে বসে বইলেন। তাবপব একসমযে ফ্ল্যাটেন হঠাৎ দাঁডিযে উঠে মাতালেব মত টলতে টলতে খাবাব ঘব থেকে বেডিযে গেলেন। ধীবে ধীরে তাঁব পদশব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতব হযে দূর বাতাসে মিলিযে গেল।

বেগিণাব কেমন যেন স্থির ধাবণা হ'ল, এইবার বুঝি একটা পিস্তলের আওযাজ কানে ভেসে আসবে। সে আঙুল দিয়ে কান ঢেকে বহুক্ষণ সেই মুহূর্তটিব জন্যে সভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর এক সময নিঃশব্দে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাউসকিপার এসে জিজ্ঞাসা করল, আজ আর তাঁরা সাপার খাবেন কিনা। রেগিণা শান্তস্বরে উত্তর দিলে, "না।"

হাউস্‌কিপার চলে যেতেই রেগিণা সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী আকারে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছে। সেইদিকে রেগিণা অন্যমনস্কের মত চেয়ে আছে। তার হাত-পা অসম্ভব কাঁপছে। সে অধীর হয়ে চিন্তা করছে, 'এ আমি কি সর্বনাশ করলাম!'

রেগিণার মাথা ঘুরছে। তার মনে হচ্ছে সে যেন খাড়া পাহাড়ের ঠিক কিনারাটিতে অনিবার্য পতনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সে পুনর্বার তার শিশুটির কথা চিন্তা করতে চেষ্টা করলে। এতক্ষণে কিছুটা অন্যমনস্ক হবার মত সে যেন একটা উপলক্ষ্য পেলে। তার সারা অঙ্গ এক অপূর্ব পুলকে ভরে উঠল। তার মনে হতে লাগল, এখন ঐ একটিমাত্র প্রাণীই এ পৃথিবীতে তার সর্বস্ব!

সারা বাড়ীটাতে এক অনৈসর্গিক স্তব্ধতা নেমে এসেছে। চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত নিঃশব্দে চলাফেরা করছে এবং চুপিসারে কথা বলছে। বরফের স্তূপ থেকে ভেসে-আসা আলোকোচ্ছ্বাস এতক্ষণ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বিকীর্ণ হচ্ছিল--অকস্মাৎ ফিকে অন্ধকার গড়িয়ে এসে ঘরের প্রতিটি কোণাকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে ফেললে। রেগিণা সেই প্রদোষ-অন্ধকারে সোফায়

শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত চিন্তা করতে লাগল, সন্তানের জন্য ব্যাকুলতায় এ কি সর্বনাশ সে করে বসেছে!

দীর্ঘ দু'তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেল। রেগিণার এই নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা আর সহ্য হচ্ছে না। সে জুতো খুলে ফেলে, পা টিপে টিপে, ফ্ল্যাটেনের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। ঘরের মধ্যে জীবনস্পন্দনের কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। গা-চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলে, ফ্ল্যাটেন জানালার সামনে বসে, হাতের ওপর মাথা রেখে নিস্পন্দভাবে বসে আছেন। ঘরের ক্ষীণ আলোকে তাঁকে একটি অস্পষ্ট নিষ্প্রাণ মূর্তির মত দেখাচ্ছে।

রেগিণা আবার পা টিপে টিপে নীচে নেমে এল। ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হয়ে আসছে। রেগিণার কেমন যেন শীত শীত করছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সে পূর্ববৎ পায়চারি করেই চলল। অবশেষে সে যখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন খাটে গিয়ে মড়ার মত শুয়ে পড়ল।

ষোলো

সন্ধ্যার পর সেই যে ফ্ল্যাটেন বেড়াতে গেলেন দ্বিপ্রহর রাত্রি হয়ে গেল তবু তাঁর ফিরে আসবার নাম নেই। রেগিণার একটু তন্দ্রা এসেছিল, ঘুমের আবেশ ভাঙ্গতেই লক্ষ্য করলে যে, ফ্ল্যাটেন শয্যার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। তখনও তাঁর পোষাক ছাড়া হয়নি। হাতে একটা বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অস্ফুট-স্বরে কি যেন বলছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল, এতক্ষণ যেন তিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছিলেন।

বাতিটা নামিয়ে রেখে রেগিণার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে ফ্ল্যাটেন শান্তস্বরে বললেন, "রেগিণা, এ কথা তুমি আগে বলনি কেন? আজই বা বললে কেন? কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি, সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে শক্তি দেন। আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। এই কথা বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর গম্ভীর হয়ে এল, তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

এখন আর তোমাদের কথা তার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। রেগিণা ঘৃণাভরে ভাবল, যখনই কোন প্রবীণ, বয়স্ক লোক তরুণী ভার্যা গ্রহণ করে তখন সে যেন তার পায়ে পোষা কুকুরের মত লুটিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু আমার কাছে সে নিয়ম খাটবে না, দরকার হলে আমি শক্ত হতেও জানি।

হাতের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটেন নৈশবাতি জ্বাললেন। রেগিণা তখনও মট্‌কা মেরে, চোখ বন্ধ করে, ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। তিনি ভাবছেন রেগিণা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়ত চিন্তা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। যা' ইচ্ছা ভাবুন তিনি, রেগিণার তাতে কিছু যায়-আসে না। ফ্ল্যাটেনের শুয়ে পড়ার বহুক্ষণ পরেও রেগিণা তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল।

পরের দিন সকালে ফ্ল্যাটেন যথারীতি অফিসে গেলেন। তিনি এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন মর্মদাহ ভুলতে তিনি কাজের ভেতর ডুবে যেতে চান। তা'রপর কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁর শিশু-সুলভ সরল ব্যবহারে রেগিণা অনেকটা আত্মবিস্মৃত হ'ল। তার মনের মধ্যে থেকে কে যেন চাৎকার করে বলে উঠল, অমন লোকের মনে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ!

রেগিণা পুনরায় সন্তানের মা হতে চলেছে। এই উপলব্ধি-মাত্রেই রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে ভাব'ল, এর সম্যক্ প্রতিফল দেওয়া দরকার। যথাকর্তব্য সে স্থির করে ফেললে।

আজ খেতে বসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বেশ খানিকটা বচসা হয়ে গেল। কয়েকদিন ধরেই ফ্ল্যাটেনের মেজাজ বিগড়ে ছিল, সুতরাং আজ সহজেই তিনি রেগে উঠলেন। রেগিণা হঠাৎ খুব নির্লিপ্তভাবে বলে বসল, "একটা গোপন কথা তোমাকে আজও বলিনি, আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান এসেছিল আমি তাকে মেরে ফেলেছি।"

ফ্ল্যাটেন সবেমাত্র জলের গ্ল্যাসটি মুখে তুলেছিলেন, এ কথা শোনামাত্র তাঁর হাত থেকে গ্ল্যাসটি মেঝেতে পড়ে গেল। তিনি প্রথমে হাসতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পরমুহূর্তেই টেবিলের ওপর প্রবল বেগে একটা ঘুসি মেরে চীৎকার করে উঠলেন, "নাঃ, বড্ড বাড়িয়ে তুললে দেখছি!"

ফ্ল্যাটেন চোখ পাকিয়ে টেবিলের এ পাশে এসে দাঁড়ালেন। রেগিণা এমনভাবে বেড়ালের মত লাফিয়ে এগিয়ে এল, যেন পেলে এক্ষুণি সে ফ্ল্যাটেনের টুটিটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ফ্ল্যাটেনও তার হাত মুচড়ে ধরে চীৎকার করে উঠলেন, "বল, এ কথা তোমার মিথ্যে!"

রেগিণা হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে বললে, "বললাম ত, আমি তাকে মেরে ফেলেছি।"

নিজের রূঢ় আচরণে লজ্জিত হয়ে ফ্ল্যাটেন হঠাৎ রেগিণার হাত ছেড়ে দিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে বললেন, "তুমি আমাকে পাগল করে তুলবে দেখছি, আমাকে খুন না করে কি তুমি ক্ষান্ত হবে না?" এই কথা বলে তিনি ছুটে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

পদশব্দ আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল এবং আবার ওপরের ঘরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ কাণে ভেসে এল।

আবার সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে এল আর রেগিণা শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চলল। যথারীতি

সে শিশুটির সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে লাগল। এইভাবে ক্রমশঃ তার মন শান্ত হয়ে এল। তখনও ফ্ল্যাটেনের অশ্রান্ত পদশব্দ অবিশ্রাম ঘরের মেঝেতে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রেগিণা ফ্ল্যাটেনের জন্যে শয়নকক্ষে অপেক্ষা করে বসে রইল, কিন্তু তিনি শুতে এলেন না। পরদিন প্রভাতে হাউসকিপার একখানা চিঠি এনে তার হাতে দিয়ে জানালে, বিশেষ জরুরী কাজে ফ্ল্যাটেন গুটেনবার্গ চলে গেছেন।

পরের দিন ফ্ল্যাটেনের আর একখানা চিঠি পেল রেগিণা। সারারাত্রি জেগে তিনি একখানা অতি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। রেগিণা আদ্যন্ত চিঠিখানা পড়ে গেল। চিঠিখানি অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় মনে হ'ল তার কাছে। এখন সস্তা হৃদয়াবেগের কি মূল্য আছে তার কাছে? দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী যন্ত্রণা ও মনঃকষ্টের ব্যাপক ফিরিস্তি দেখে সে ঠোঁট বেঁকাল। তারপর সুরু হয়েছে আত্মধিক্কারের বর্ণনা। শেষে ফ্ল্যাটেন লিখেছেন, এখনও তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা উভয়ে পরস্পরকে ভালবেসে এবং বিশ্বাস করে নতুনভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন। সব শেষে তিনি লিখেছেন, পরের দিন তিনি বাড়ী ফিরে আসছেন।

রেগিণা অবহেলাভাবে চিঠিখানাকে কোলের ওপর ফেলে রাখলে। তার বর্তমান অবস্থায় চিঠিখানি তার মনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। সে চম্‌কে উঠে ভাবলে, কালই তাহলে উনি বাড়ী ফিরে আসছেন। হয়ত ফিরে

এসেই তাকে জড়িয়ে ধরে ভালবাসা, ক্ষমা, ভগবান্‌ প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা শোনাবেন। না, সে চিন্তাও অসহ্য। সে কোন মতেই ঐ সব ন্যাকামী সহ্য করতে পারবে না। তার চেয়ে .....।

সে দ্রুতপদে তার পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মনে হ'ল অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে গিয়ে সে যেন প্রতি-পদেই ঠোক্কর খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি একখণ্ড কাগজে কয়েক লাইন চিঠি লিখে ফেললে। তারপর চাকরকে ডেকে নির্দেশ দিলে, চিঠিখানা যেন প্রথম ডাকেই গুটেনবার্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত ব্যাপারটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল। এতক্ষণে রেগিণা নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর পেলে।

সেই ছোট্ট চিঠিখানিতে মাত্র এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল :

"প্রিয় অ্যাণ্ডু,

তোমাকে কোন কথা গোপন করা উচিত নয়। যে সন্তান আমি গর্ভে ধারণ করছি তার পিতা তুমি নও।"

রেগিণা ভাবলে এই-ই যথেষ্ট। আবার নতুন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে নিজেকে হেয় করছে বটে, কিন্তু ঐ কয়েকটি কথার ধাক্কা বৃদ্ধের পক্ষে সামলানো কঠিন হবে। রেগিণা চমকে উঠে অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। বারে বারে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, সত্যিই নররক্তে তার হাত কলুষিত হয়েছে কি না। কিন্তু আর ত কোন পথ

খোলা নেই। সে আরও ভেবে দেখলে যে যতবারই সে ফ্ল্যাটেনকে আঘাত করতে গেছে ততবারই তিনি হাসিমুখে প্রেম জানাতে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু আর নয়, এবারে যা হোক একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাক্।

কিছুক্ষণের জন্যে রেগিণা তার পুত্রের চিন্তায় ক্ষান্ত দিলে। কারণ, ভেবে দেখলে, সে যে কু-কাজে লিপ্ত হতে চলেছে তার মধ্যে তার পুত্রের পুণ্যময় স্মৃতিকে টেনে আনা অত্যন্ত অন্যায় হবে। না, এ কাজের সমস্ত দায়িত্ব তার নিজের একলার। সে প্রমাণ করতে চায় যে, সে এ কজন হীনতম হত্যাকারিণী— বিবেকের দংশন-জ্বালা অবিভক্তভাবে সে একাই সহ্য করতে চায়।

বিকেল উত্তীর্ণ হয়ে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হ'ল। রেগিণার মনে হ'ল দেওয়ালের ছবিগুলো পর্যন্ত যেন অন্ধকারে তাকে হাঁ করে গিলতে আসছে। অত বড় বাড়ীর নির্জনতায় সে হাঁপিয়ে উঠল। একা থাকতে আর তার সাহস হল না, অগত্যা হাউস-কিপারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়,ল।

বরফ ভেঙ্গে তারা দু'জনে নীরবে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার বরফ তুলে দু'পাশে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। তুষারাচ্ছাদিত ধূসর মাঠগুলির ওপরে মেঘভরা একখণ্ড আকাশ আশু বর্ষণের অপেক্ষায় যেন ঝুলে রয়েছে। মেঘের স্তরের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও বা দু' একটি হলদে তারা জ্বল জ্বল করছে। তারা দুজনে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে অনেক ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে তারা বাড়ী ফিরে এল। ফাঁকা হাওয়া বেগিণার এতক্ষণ বেশ ভালই লাগছিল। বাড়ী ফিরে এসে যখন খাবার টেবিলে গিয়ে বসল তখন তার হাত-পা রীতিমত কাঁপতে সুরু করেছে। সে যেন শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-শিহরণ অনুভব করলে। গ্লাসের পর গ্লাস সে মদ খেয়ে চলল। অবশেষে যখন রাত্রি গভীর হয়ে এল তখন গ্লাসটিকে পাশের টেবিলে সরিয়ে রেখে অন্ধকারে হাতরাতে হাতরাতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

অত্যধিক মদ্যপানের ফলে পরের দিন অনেক বেলায় বেগিণার ঘুম ভাঙ্গল। সে অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল। সে যেন কিছু একটা খবরের জন্য তখনও সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, তার নামে কোন 'তার' এসেছে কি না। কোন টেলিগ্রাম আসেনি শুনে সে উঠে পড়ল। নৈশবাসের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে সে অস্থির-ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পূর্বরাত্রে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছিল। জানালার পর্দাটা সরিয়ে সে বাইরের ঘনবনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। গোটা উপত্যকাভূমি তখনও পাতলা কুয়াসার জালে জড়িয়ে আছে। সে প্রতিমুহূর্তেই আশা করতে লাগল, এইবার বুঝি সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দুঃসংবাদটি এসে হাজির হয়।

দরজায় মৃদু টোকার শব্দে চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখে, অন্য কিছু নয়, পরিচারিকা অন্যান্য দিনের মত প্রাতঃকালীন কফি

পরিবেশন করতে এসেছে। যতই বেলা বাড়তে লাগল ততই বেগিণার ভয় করতে লাগল। অবশেষে তার স্থির বিশ্বাস হ'ল, এবার যে কোন মুহূর্তে ফ্ল্যাটেন হয়ত সশরীরে এসে হাজির হবেন।

বিকেলের দিকে বেগিণা শোবার ঘরের বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ লক্ষ্য করলে, দূরে টেলিগ্রাম পিওন আসছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে তড়িতাহতের মত বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট পরেই হাউসকিপার একখানা টেলিগ্রাম এনে বেগিণার হাতে দিল। গুটেনবার্গে ফ্ল্যাটেন যে হোটেলে উঠেছেন সেখানকার ম্যানেজার 'তার' করেছেন, গত রাত থেকে ফ্ল্যাটেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

একটু সামলে নিয়ে বেগিণা তার স্বামীর হেড ক্লার্ককে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ দিলে, তিনি যেন অবিলম্বে গুটেনবার্গ চলে যান এবং সেখানে পৌঁছেই তার স্বামীর শারীরিক অবস্থা জানিয়ে 'তার' করেন।

হেড্‌ক্লার্ক চলে যেতেই বেগিণা আবার শুয়ে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে শুয়েই রইল। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল কিন্তু এরূপ বিভ্রান্ত অবস্থায় প্রার্থনা করার কথা তার একবারও মনে এল না।

সন্ধ্যার দিকে হেড্‌ক্লার্কের 'তারে' জানা গেল, ফ্ল্যাটেনের মৃত্যু হয়েছে।

সতেরো

এই শেষবারের মত রেগিণাকে আর একবার মুখে মুখোস আঁটতে হোল। গুটেনবার্গে গিয়ে সে স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলে। ফ্ল্যাটেনের কয়েকটি ব্যবসায়ী বন্ধু মাত্র উপস্থিত ছিলেন। নরওয়ে থেকে কাউকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কোন আত্মীয়-স্বজন এমন কি ফ্ল্যাটেনের দু'জন ভগ্নীকেও কোন সংবাদ দেওয়া হয়নি।

যখন স্বামীর শবাধারটি আগুনে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন রেগিণা একবার আকুল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। সবাই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ-কৃত্য চুকে গেলে উপস্থিত সকলে টুপি তুলে রেগিণাকে বিদায় জানিয়ে, যে যার কাজে চলে গেলেন। রেগিণা হেড্‌ক্লার্কের কাঁধে ভর দিয়ে নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করছিল। মনে হ'ল এই আকস্মিক বিপদে সে যেন খুব ভেঙ্গে পড়েছে।

সেই বিকেলে রেগিণা নরওয়েগামী ট্রেণে চেপে বসল। হেডক্লার্ক বিপরীত দিকের আসনে বসে রেগিণাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সে কোন কথায় কান না দিয়ে অন্যমনস্কের মত চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে ছিল। তার মনের অতলে যে ভাবতরঙ্গ খেলছিল সে প্রাণপণে তা' দমন করবার চেষ্টা করছিল।

অবশেষে বেগিণা সেই নিঃসঙ্গ বাড়ীতে একা ফিরে এল। এখন এ বাড়ীর সব কিছুই তার নিজের। যতদিন পর্যন্ত না তার বিষয়-সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা হয় ততদিন সম্পত্তি-পরিচালনার ভার সে হেড ক্লার্কের ওপর ছেড়ে দিলে।

কিন্তু বেগিণার মুক্তি কোথায়? এ বাড়ীর সব কিছুর সঙ্গেই ফ্ল্যাটেনের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, অথচ যতদিন পর্যন্ত না তার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন পর্যন্ত এ বাড়ীর সঙ্গে সে শেকল দিয়ে বাধা। তার নিজের সন্তানের খোঁজ-খবর ততদিন পর্যন্ত নেবার কোন সুযোগই সে পাবে না—এই চিন্তামাত্রেই তার মেজাজ অসম্ভব রকম বিগড়ে গেল। এই সব হাঙ্গামা চুকতে যাকে বলে মার্চ মাসের শেষের দিক। ততদিন সময় কাটানো ছাড়া আর উপায় কি।

বেগিণা ভাবতে লাগল, এখন যে সন্তান তার গর্ভে ভ্রূণাকারে অবস্থান করছে নিতান্ত অসহায়ের মত, সে হয়ত উত্তরকালে একদিন বিচারকের ভঙ্গীতে ন্যায়দণ্ড তুলে ধরবে তারই বিরুদ্ধে। কিন্তু তবুও তাকে ধারণ করা ও রক্ষা করা তার ধর্ম ও কর্তব্য। সেই পুণ্যময় কর্তব্য-পালনে সে তৎপর হ'ল।

এমনি ভাবে নীরস দিনগুলি কেটে যেতে লাগল। বেগিণা কোনমতে নিজেকে খাড়া রাখবার জন্যে তার নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের চিন্তায় আরও বেশী করে নিজেকে মগ্ন রাখলে। তার একমাত্র আশা, তার নিজের সন্তানটি একদিন বড় হয়ে উঠে তাকে সমস্ত দুরদৃষ্ট থেকে রক্ষা করবে। তার দগ্ধভাগ্যে যতই লাঞ্ছনা

আসুক না কেন, সমস্তই সেই শিশুটি হাসিমুখে প্রতিহত করবে। সে পৃথিবীকে শুনিয়ে গর্বভরে বলবে, এই আমার দুঃখিনী মা, যিনি আমার জন্যে শত দুঃখ ও লাঞ্ছনা নীরবে ও নতমুখে সহ্য করেছেন। এঁকে সকল অপমান থেকে রক্ষা করা এখন সর্বতোভাবে আমারই কর্তব্য।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস এমনি করে গড়িয়ে চলল। তুষার-ঝরা ঘোড়ো শীতের দিনগুলিও গতপ্রায়। এমন দিনে বেগিণার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। ফুটফুটে একটি ব্যাটাছেলে। এখন যদিও বেগিণার ঐশ্বর্যের অভাব নেই তবুও এতে বেগিণা খুসী হয়ে উঠতে পারল না। শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মন গর্বে ভরে উঠল না। তার মনে হ'ল, কে যেন তার বক্ষ হিমানীস্পর্শে অসার করে দিয়েছে।

প্রত্যহ বেগিণা এই নবজাত শিশুটিকে স্তন্যপান করাত আর জানালা দিয়ে আসা শীতের দিনের ফ্যাকাসে আলোতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। শিশুটি যখন স্তন্যপান করত তখন বেগিণার মনে হ'ত যন্ত্রণায় তার শিরদাড়া বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। এমনি করে যতই দিন যেতে লাগল ছেলেটিও ততই একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

একদিন বেগিণা সংবাদ পেলে তার মা মারা গেছেন। এ সংবাদে বেগিণা খুব বেশী মর্মাহত হল' না। বোধ হয় আর

অধিক দুঃখ-সহনের ক্ষমতা তার অবশিষ্ট ছিল না। ইদানীং আবার বহুদিনের অদর্শনে ও মনের নানা বিরুদ্ধ অবস্থায় স্মৃতিপটে মায়ের মুখখানা যথেষ্ট অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। বেগিণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে, এখন আমার নিরুদ্দিষ্ট সন্তানটি ছাড়া এ পৃথিবীতে আপনার জন বলতে আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। এখন তাকে খুঁজে বার করাই আমার একমাত্র কাজ।

মে মাসের মাঝামাঝি একদিন বেগিণা তার নবজাত শিশুটিকে নিয়ে গুটেনবার্গ চলে গেল এবং সেখানকার একজন ডাক্তারের জিম্মায় তাকে রাখবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললে।

এতদিনে বেগিণা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর পেয়েছে। সমস্ত জমি-জমা বিক্রি করে দিয়ে সে প্রায় দশ লক্ষ ক্রোণার সংগ্রহ করলে। এখন তার জীবনে আর একটিমাত্র কাজ বাকী।

একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করলে, তার সুন্দর সোনালী চুলে পাক ধরেছে আর মুখখানাও হয়ে উঠেছে ক্ষয়রোগীর মত ফ্যাকাসে আর রক্তহীন।

আঠারো

১৮৮০ সালের গ্রীষ্মকালে ক্রিষ্টিয়ানা সহরের কাগজে কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল :

"দু' বছর আগে, মার্চ মাসে কোন এক দম্পতী এখানকার প্রসূতিসদন থেকে একজন শিশুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সেই অজ্ঞাত দম্পতীর বর্তমান ঠিকানা সম্বন্ধে যে কেউ এই কাগজের মারফৎ কোন সন্ধান দিতে পারবেন তিনি প্রচুর পুরস্কৃত হবেন। ইতি.......আর্।"

এখন জুন মাস। স্টুডেণ্টস্ গ্রোভের ফিকে সবুজ গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে কালো পোষাকপরা একজন মহিলা একাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেলা দুপুর গড়িয়ে এল তবুও তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন না। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর পরিশ্রান্ত হয়ে একটা বেঞ্চিতে তিনি বসে পড়লেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, খাবার বেলা হয়েছে। ভাবলেন, সেই বেলা ছ'টা পর্যন্ত কোন মতে কাটাতেই হবে। ছ'টার পর খবরের কাগজের অফিসে যাওয়া এবং খোঁজ নেওয়া—কোন চিঠি-পত্র তাঁর নামে এসেছে কিনা। প্রতিদিন এইভাবে আশা-উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে মন্থর গতিতে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে।

এইভাবে রেগিণা ধনী বিদেশিনীর মত হোটেলে নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছে। হোটেলের বিল হাতে আসতে প্রথম তার

খেয়াল হ'ল, দীর্ঘ একমাস সে এই সহরে একটানা বসে রয়েছে। ধৈর্য ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। হয়ত একদিন না একদিন সেই বহু-আকাংক্ষিত সংবাদটি এসে যাবে আর যতদিন না তা' আসছে ততদিন তাকে নিঃসঙ্গ প্রহরা গুণতেই হবে।

যে উকীলটিব ওপর রেগিণার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার, তাঁকে একদিন রেগিণা সব কথা খুলে বললে। তিনিও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন শিশুটির সন্ধান করতে কিন্তু বিশেষ কোন ফল হ'ল না। তিনি রেগিণাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, এ যেন অন্ধকাবে ঢিল ছোড়া হচ্ছে। এ ভাবে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে কিনা সে বিষয়ে ঘোবতর সন্দেহ আছে। হয়ত তার ছেলেটি পেবেম্বুলেটারে করে এই সহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাকে চিনবার যো নেই। যদি ধরেই নেওয়া হয় যে ছেলেটি এখনও সেই ধনী পরিবারে পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হচ্ছে তা'হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে এতদিনে ছেলেটির ওপর তাঁদের বিশেষ মায়া পড়ে গেছে। তাঁরাই কি ছেলেটিকে সহসা ছেড়ে দিতে রাজী হবেন? আইনের দৃষ্টিতে ছেলেটি এখন তাঁদেরই। কেননা ছেলেটির মা তাকে স্বেচ্ছায় দত্তক দিয়েছে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করলে এখন অপেক্ষা ও ধৈর্য ধরা ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই। দেখাই যাক, বিজ্ঞাপনের ফল কি দাঁড়ায়! এইসব যুক্তি-সম্ভাবনার কথা ভেবে রেগিণার মন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়ল।

উকীল ভদ্রলোক বহু অনুসন্ধানের পর রেগিণাকে জানালেন

যে ফ্ল্যাটেনের ভগ্নী দুজনের মধ্যে কেউ-ই কোন দত্তক গ্রহণ করেননি। রেগিণার মনে এতদিন পর্যন্ত যে ক্ষীণ সম্ভাবনার আলো ধিকি ধিকি জ্বলছিল, এই সংবাদে সেই আলোক-বর্তিকা চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গেল। প্রতি প্রভাতেই শয্যাত্যাগ করে রেগিণা দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে ভাবত, আজ বোধ হয় কিছু একটা সন্ধান পাওয়া যাবে কিন্তু প্রতিদিনই তার প্রত্যাশা ব্যর্থ হত। এমনিভাবে বৃথা দিন কেটে যেতে লাগল, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটল না।

রেগিণা ভেবে দেখলে, যে সম্পদ সে এত উচ্চমূল্যে করায়ত্ত করেছে তা' বুঝি কোন কাজে এল না। এতদিন যে বিশ্বাস সে আঁকড়ে ধরে বসেছিল, তার মূল ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। তার মন ক্রমে ক্রমে ভয় ও অসন্তোষে ভরে উঠল। দৃঢ়তার সঙ্গে রেগিণা তার দুর্বল মনের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে চলল।

একদিন খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে রেগিণা সন্ধান পেলে যে তার নামে দুখানা চিঠি এসেছে। সে তাড়াতাড়ি চিঠি দু'খানা খুলে ফেললে,—সে দুখানির সঙ্গে যে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে! খুলতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠল!

দু'খানা চিঠির একখানা খৃষ্টানস্যাণ্ড ও অপরখানি রোমসড্যাল থেকে এসেছে। দু'জন সংবাদদাতাই জানিয়েছেন যে তাঁরা অভ্রান্তরূপে সেই আকাংক্ষিত দম্পতীর সন্ধান পেয়েছেন।

বহুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে রেগিণা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই সংবাদে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। চাঞ্চল্যের আবেগে তার সর্বশরীর ঠকঠক্ করে কাঁপতে লাগল। এ ভয় নয়, এ যেন এক অনাস্বাদিত নতুন অনুভূতি। সে অবাক হয়ে ভাবলে, তবে এর নামই কি সুখ? পরিপূর্ণ আনন্দরূপ কি একেই বলে?

কাগজের অফিসের কাউন্টারে বসা মেয়েটির হাতে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে রেগিণা তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এল। সে তৎক্ষণাৎ জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদার কাজে লেগে গেল। কোনরকম গোছাগুছির ঝামেলা না ক'রে সে কোনও প্রকারে জামাকাপড়গুলিকে বাক্সে ভরে নিলে। পরিশ্রমের আধিক্যে মাঝে মাঝে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে দম নিতে লাগল—থেকে থেকে তার চোখ জলে ভরে এল—অবশেষে ঐখানেই বসে পড়ে সে অদম্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, তা'হলে অধিক আনন্দেও চোখে জল আসে! এতদিন তার বুকে যেন এক চাঁই বরফ জমাট বেঁধে ছিল, এতদিনে এক ঝলক দখিনা বাতাসে সেই বরফ গলে গলে পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যায় রেগিণা বার্গেন-গামী ষ্টীমারে চেপে বসল। ফ্লোর্ড নদীর ওপর দিয়ে ধীর-মন্থর গতিতে ষ্টীমার চলেছে। চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে গৃহপ্রত্যাগত বিরহীজন যেমন আশা-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রেগিণারও তেমনি মনে হ'তে

লাগল, এতদিন পরে সে বুঝি তার আকাংক্ষিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে। এখন যেন সে আনন্দহ্রদে হাবুডুবু খাচ্ছে। পায়ের নীচে এখন তার শক্ত মাটির স্পর্শ—অতীত গ্লানিকর জীবনযাত্রা, দুর্বহ দুশ্চিন্তা আর তার নাগাল পাবে না। আকাশে যে সোনালী আর রূপোলী রঙের ছবি ফুটে উঠেছে সে তো রেগিণার বর্তমান মানসপ্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি।

সূর্য আস্কারের স্বচ্ছ আকাশের রঙীন মেঘমালার মধ্যে দিয়ে দ্রুত অস্তগমনে চলেছে। ইতিপূর্বে এমন গৌরবময় অস্তগমন যেন তার ভাগ্যে আর কখনও জোটেনি। রেগিণা সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার এখনকার অবস্থা ঠিক সেই ভিখারীটির মত যে রাস্তার ফুটপাতে দীনতম ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলে যে সে স্বর্গদ্বারে পৌঁছে গেছে। এক অননুভূত পুলকে রেগিণার অন্তরাত্মা মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হতে লাগল। অনাদি কাল থেকেই সে যেন এই সুখ-সাগরে ভেসে আসছে। ষ্টীমারের বাঁশী পাখীর কূজনের চেয়েও সুমিষ্ট বোধ হচ্ছে। এক উদ্গত অশ্রুর বন্যা রেগিণার গলা ঠেলে উঠতে লাগল কিন্তু কষ্টে সে তা' দমন করলে।

ক্রিষ্টিয়ানা সহর ক্রমশঃ ফ্লোর্ড নদীর বুকের ওপর ভাসমান কুয়াশা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে। সূর্য এখন পশ্চিম দিগন্তে অবলুপ্ত প্রায়। আকাশের রঙ ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। ধূসর সোনালী মেঘগুলি নীলবর্ণ হয়ে আঁধারে বিলীন হয়ে গেল। ষ্টীমার সফেন তরঙ্গমালা

অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতের সময়ও এগিয়ে আসছে। দূরে, দিকচক্রবালের দিকে দেখা যাচ্ছে আলো-ঘরের মিট্‌মিটে হল্‌দে আলোকশিখাটিকে।

পরদিন প্রত্যূষে রেগিণা সামান্য বেশ-পরিধান করে একখানা গাড়ী ডাকিয়ে তাতে চড়ে বসল। ক্রিষ্টানস্যাণ্ড সহরের সুন্দর ও চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে নির্দিষ্ট ঠিকানার দিকে। ফ্রু লার্সনের আস্তানা খুঁজে বের করতে খুব বেশী বেগ পেতে হ'ল না।

সহরের উপকণ্ঠে একটা কাগজ ও টুপীর দোকানের ভেতরে ফ্রু লার্সন বসেছিলেন। ফ্রু লার্সনের বয়স হয়েছে, থলথলে মোটা চেহারা এবং মাথার সব ক'টি চুলই পাকা। দাঁতও অনেককটি পড়ে গেছে। ক্ষুদে চক্‌চকে চোখ তুলে তিনি রেগিণার দিকে তাকালেন। রেগিণা কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে মনে মনে ভাবলে, কি সবনাশ! এও কি সম্ভব যে আমার ছেলেটি এই ডাইনীটার কাছে মানুষ হচ্ছে এতদিন?

রেগিণার পরিচয় পেয়ে লার্সন তাকে সসম্ভ্রমে দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। নিজে তিনি সামনের দোলানে চেয়ারটিতে বসলেন। কোলের ওপর দু' হাত জড়ো ক'রে তিনি নানা বাজে কথায় মশগুল হবার চেষ্টা করলেন প্রথমতঃ। রেগিণা বিরক্ত হয়ে বললে, "আপনি কি আমার ছেলেটির কোন খবর জানেন?"

ফ্রু লার্সন ক্রমাগত দুলতে লাগলেন। তাঁর দেহভারে চেয়ারটা মুহুর্মুহু আর্তনাদ করে উঠল। রেগিণার দিকে কয়েক মুহূর্ত অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তিনি আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন ঠিক কতখানি চাপ মেয়েটীর সহনীয় হতে পারে। খুব বিচার-বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে, যাতে শিকারটা ফস্কে না যায়। অবশেষে চওড়া থুথ্‌নি নেড়ে তিনি জবাব দিলেন, "আমার পক্ষে এ প্রশ্নেব জবাব দেওয়া কঠিন, কেননা আমি সত্যবদ্ধ আছি এ বিষয়েব বিন্দু-বিসর্গ কারও কাছে প্রকাশ করব না বলে। কিন্তু অসহায়া একজন বিধবাব পক্ষে প্রলোভন দমন কবা তো আর সহজ নয়!"

বেগিণা আবেগ-কম্পিত বক্ষে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার খুবই তাড়া আছে, অনুগ্রহ করে যা' জানেন শীঘ্র বলুন। যত টাকা চান আমি দিতে প্রস্তুত।"

ফ্রু লার্সন করুণ ভাবে তাঁর দোকানটিব দুর্দশার কথা বিবৃত ক'বে চললেন। কে একজন বিদেশী পাওনাদাব নাকি তার নামে নালিশ কববে বলে ভয় দেখাচ্ছে। তা' হলে তাঁব সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে তাই বোধ হয় ঈশ্ববেব অভিপ্রায়, নইলে তাঁরই বা কপাল ভাঙ্গবে কেন? অথচ মজা এই যে, সেই ভগবানই আজ রেগিণাকে তাঁব উদ্ধারকর্ত্রী হিসেবে পাঠিয়েছেন। কাবণ প্রার্থনা করতে তো তাঁব একদিনও ভুল হয় না ইত্যাদি। এইভাবে অজস্র কথা বলতে বলতে ফ্রু লার্সন কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

রেগিণা রাগে জ্বলে উঠল, "কতো টাকা চায় আপনার? আমার কাছে এখন খুব বেশী নগদ টাকা নেই, কিন্তু যদি আমাব ছেলেটির সঠিক সংবাদ পাই, তা'হলে প্রচুর পুরস্কার দেবো আপনাকে।"

"একটা লোকের কাছে আমার পাঁচ হাজার ক্রোণার ধার আছে। অবশ্য এ টাকাটা আমি ধার বলেই নেবো...আপনি যদি..."

বেগিণা চেক্ লিখতে লাগল। ফ্রু লার্সন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শান্ত ভালমানুষটির মতন জ্বল্‌জ্বল ক'রে তাকিয়ে দেখছেন। লেখা হয়ে গেলে চেকখানা তাঁর হাতে দিয়ে রেগিণা বললে, "এইবাব বলুন—আর সময় নষ্ট করবেন না।"

ফ্রু লার্সন চেকখানা হাতে দিয়ে সেখানা সযত্নে ভাঁজ করে হাতে রেখে অশ্রুসিক্ত চোখে রেগিণাকে তার এই উপকারের জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিতে সুরু করতেই রেগিণা চীৎকাব করে উঠল, "আর যদি বাজে কথা বলেন তা'হলে চেকখানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলব।"

এতক্ষণে ওষুধ ধরল। লার্সন বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরম্ভ করলেন, "সত্যিকথা বলতে কি, লোকটি আমার সহোদর ভাই—রাস্তার ওপাশে তার নিজের দোকান আছে। আমার বলা উচিত হচ্ছে না তবে লোকটা বজ্জাতের ধাড়ি। শিশুটির ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি নইলে এ কথা আমি মরে গেলেও

প্রকাশ করতাম না কোনদিন। অবশ্য আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমার নাম আপনি কাহারও কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।"

রেগিণা রুদ্ধশ্বাসে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। ঠিকানাটা পেতেই সে উর্ধ্বশ্বাসে সে স্থান পরিত্যাগ করলো।

নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছে রেগিণা বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাব ভয় হ'ল বুঝি বা উত্তেজনার আক্ষেপে তার বুকটা এখুনি ফেটে পড়বে। পরমুহূর্তেই সে দরজা ঠেলে ভেতবে ঢুকে দেখলে একজন স্ত্রীলোক একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলো পোষাক গুছিয়ে তুলছে আর একটি শিশু মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে।

রেগিণা কিছুক্ষণ শিশুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তারপর অস্ফুটস্বরে কি কয়েকটি কথা বলে, তাকে সাপটে বুকে জড়িয়ে ধবে অস্বাভাবিক হাসিতে ফেটে পড়ল। উন্মাদিনী স্ত্রীলোকের মত সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে সে হেসেই চলল। শিশুটির মাথা, মুখ, চুল—সর্বাঙ্গ সে অজস্র চুম্বনে ভবিয়ে দিলে। মৃগী-রোগীর মত হাসতে হাসতে তার দু' চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু নেমে এল। এইসব দেখে শুনে শিশুটি ককিয়ে কেঁদে উঠল।

যে স্ত্রীলোকটি কাপড় গুছিয়ে তুলছিল সে কাজ ফেলে ছুটে এসে রেগিণার হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে বললে, "বলি

তোমার কাণ্ডটা কি? ছেলেমানুষকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন? এ কি পাগলামী!"

বেগিণা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে আবার হেসে উঠল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি! এ আমার ছেলে।"

"তোমার ছেলে? তোমাব কি মাথা খারাপ? ভাল চাও ত ফিরে দাও বলছি! দেখছনা বাছা আমাব ভয়ে কি রকম ককিয়ে উঠেছে!"

রেগিণা শিশুটিকে আরও সাপটে ধরে বললে, "কেন দেব? এ ছেলে আমার। কি নাম বেখেছ ওব? ওলাফ্‌?"

স্ত্রীলোকটির এতক্ষণে স্থিব ধারণা হ'ল মেয়েটির নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। সে খিঁচিয়ে উঠে বললে, "তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ?—দেখছনা ও মেয়ে, ছেলে নয়, ওব নাম ইন্‌গা।"

রেগিণা পাথরের মূর্তিব মত নিশ্চল হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটিকে ধপাস্‌ করে মাটিতে নামিয়ে দিলে। তাবপব যেন অনেকটা বিকারগ্রস্ত রুগীর মত ঘব থেকে আস্তে আস্তে বেবিয়ে গেল।

উনিশ

মধ্যরাত্রিতে রেগিণা হোটেলে ফিরে এল। এতক্ষণ সে একটা পার্কের বেঞ্চিতে নিঝুম অবস্থায় বসে ছিল। কিছুক্ষণ আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, গাছের পাতাগুলিতে মুক্তোর মত জল টলটল করছে এবং রাস্তাঘাট ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে। একটা ক্ষীণ বাষ্পরেখা আর্দ্র জনপদ থেকে আকাশপানে ঠেলে উঠছে।

সেই কঠোর আঘাতের ধাক্কা রেগিণা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। হোটেলে ফিরে গিয়ে সে বেশ কিছুক্ষণ মুহ্যমানের মত বিছানায় পড়ে রইল কিন্তু বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে তার সাহস হ'ল না। তার মনে হ'ল একটা কালো ছায়া যেন গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে তার দিকে ছুটে আসছে। ক্ষণিক দুর্বলতার সুযোগে সেই ছায়া তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। জ্ঞান হারালে চলবে না, তাকে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। ধৈর্য হারালে চলবে না, এখনও সব কিছু আশা শেষ হয়ে যায়নি! আরও একখানি চিঠি তার হাতে আছে। এখনি সাহস হারালে চলবে না!

আরও একটি রাত্রি রেগিণা সেই অচেনা সহরে, অপরিচিত একটা হোটেলের কামরায় অসহিষ্ণুভাবে কাটিয়ে দিলে। খুব ভোরে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বোধ হয় সূর্য সেদিন সকাল সকাল উঠেছিল কিম্বা মাছির ভ্যানভ্যানানী হয়ে

উঠেছিল অসহনীয় কিম্বা রোমস্‌ড্যাল সহর সর্বদা তার মাথায় ঘুরছিল। কারণ যাই হোক, সারারাত্রি তার ভাল ঘুম হয়নি। এখন মাথাটা অসম্ভব দপ্‌দপ্‌ করছে আর চোখের পাতা বুঁজে বুঁজে আসতে চাইছে। উত্তপ্ত চক্ষুযুগলের ওপর নৃত্যশীলা মরীচিকার মত নানা উদ্ভট দৃশ্যাবলী তার চোখের সামনে ভেসে আসছে। সে অনুভব করলে, হাত-পায়ের পাতাগুলি ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে।

সেই কৃষ্ণবর্ণ ছায়াটি তাকে গ্রাস করতে দুর্বার বেগে ছুটে আসছে। এখন মাঝপথে সে যদি এই ব্যর্থ পরিক্রমা পরিত্যাগ ক'রে মুষড়ে পড়ে, তাহলে সেই কৃষ্ণ ছায়া তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলবে। এখন সাহস ও বল হারালে চলবে না। এখন তার একমাত্র কর্তব্য সামনে এগিয়ে চলা, পিছন ফিরে তাকালেই সর্বনাশ !

পরদিন আবার যাত্রা সুরু হ'ল। প্রবল উত্তেজনার কল্যাণে সমুদ্র-পীড়াকে রেগিণা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। আজ সমস্ত রাত্রি হয়ত সমুদ্র অশান্ত থাকবে কিন্তু কাল সকালেই তারা বার্গেন পৌঁছে যাবে এবং তারপর বহুক্ষণ ধরে তারা পাবে পর্বত-মালাবেষ্টিত শান্ত জলপথ। দূরে কাল কাল আকাশচুম্বী সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে জেলেদের ছোট ছোট কুটিরগুলি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মনে হয় সূর্যালোক কোনদিনই সেই সব কুটিরে প্রবেশ লাভ করেনি। পাহাড়ের গায়ে একটা

জেলে নৌকো বাঁধা রয়েছে। এই সব দৃশ্য অতিক্রম করে ষ্টীমার ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে চলল।

রেগিণা একটা ছোট আঁট টুপী মাথায় দিয়ে ডেকে বসে আছে। বাতাসে তার জামার কলার উড়ছে। বাইরের নিরানন্দ অন্ধকার তার ভেতরেও খানিকটা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তার মন কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো চিন্তায় ডুবে গেল।

মোল্ডে-বে তে তাদের ষ্টীমার পড়তেই আবহাওয়া বদলে গেল। এখন দীপ্ত সূর্যালোকে দিক্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর নবজন্ম হ'ল যেন। যাত্রীরা সব ডেকের রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে উজ্জ্বল প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন হাসির ঝলকে উছলে পড়ে তটে ভেঙ্গে পড়ছে। তীরের সবুজ বনানীর বুকে চোখ জুড়োনো স্নিগ্ধতা। তুষার-মণ্ডিত পর্বতের চূড়াগুলি নির্মেঘ আকাশের বুকে ঝ·মল করছে। সমুদ্রের সফেন তরঙ্গমালা পাহাড়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আধখানা পাহাড়কে মুহূর্তের জন্য গ্রাস করে ফেলছে। ফার ও অন্যান্য বৃক্ষে সমাকীর্ণ দূরের উপত্যকাভূমির উর্বরা জমিগুলি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দেখতে দেখতে ছোট সহরটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুন্দর সুসজ্জিত সহর। যেন সাজানো বাগানের মধ্যে কতকগুলি সুদৃশ্য বাড়ী বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সুন্দর আবহাওয়া ও নয়নাভিরাম দৃশ্যে রেগিণার মনের প্রফুল্লতা অনেকটা ফিরে এল।

সেইদিন বিকেলে রেগিণা অপর পত্রপ্রেরকটির উদ্দেশ্যে

বেরিয়ে পড়ল। বহু রাস্তাঘাট পেরিয়ে একটা বড় গোলাবাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বড় সাদা রঙের বাড়ী, লাল টালি-ছাওয়া বৃহৎ গো-শালা ও সুসজ্জিত বাগান দেখে মনে হয় গৃহস্বামীর অবস্থা ভালই। বাড়ীর মালিক উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যমদূতের মত চেহারা, মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘন কালো চুলের ওপর একটা চোঙাওয়ালা টুপী বসান। পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে তিনি পাইপ টানছিলেন। বিরক্তিপূর্ণ চোখে তিনি একবার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তারপর এগিয়ে এসে টুপী তুলে অভিবাদন জানালেন।

রেগিণা পবিচয় দিতেই তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি রেগিণাকে পথ দেখিয়ে একটা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ঘবটার নতুন কলি ফেরান হয়েছে। রেগিণা বসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জন্যে এক কাপ গবম দুধ এল। লোকটি কাসতে কাসতে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দুধটা কোন রকমে গলাধঃকরণ করে গৃহস্বামীর দিকে রেগিণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে। লোকটি সেখানকার নতুন জেলা-শাসকের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করতেই রেগিণা তাঁকে চেনেনা বলায় তিনি বেজায় উৎসাহেব সঙ্গে তাঁর নিন্দেবাদে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। স্বাধীনজীবী শান্ত চাষীদের ওপর লোকটা নাকি বেজায় খাপ্পা – অত্যন্ত কদর্য ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে। একটানা এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে লোকটি একবার

আড়চোখে দেখে নিলেন রেগিণার ওপর তাঁর বক্তৃতাটির কি রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

কিছুটা সৌজন্যের খাতিরে রেগিণা এইবার মন্তব্য করলে, "তাই নাকি ? লোকটা তা'হলে ভারা অভদ্র ত !"

রেগিণার সমর্থনসূচক উক্তিতে লোকটি উৎসাহের সঙ্গে আবার একচোট গালি-গালাজ সুরু করে দিলেন।

রেগিণা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। সে বাধ্য হয়ে এই বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি এরই কথা চিঠিতে লিখেছিলেন ? হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা কোন ছেলেকে তিনি দত্তক নিয়েছেন কি না বলতে পারেন ?"

"সেটা অবশ্য সঠিক জানিনা। তবে..."

রেগিণা বুঝল এ বিষয়ে আর তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদ করা বৃথা ! সে উঠে পড়ল। লোকটি তার পেছনে পেছনে বাইরে এসে অদূরের একটা বাড়ী দেখিয়ে বললেন "ঐটা তার বাড়ী।" তারপর রেগিণাকে বিদায় দেবার পূর্বে আর একবার মনে করিয়ে দিলেন, "লোকটা কিন্তু বেজায় ধড়িবাজ। একবার যদি আইনের প্যাঁচে তাকে পান, খবর্দার কিছুতেই রফা করবেন না যেন—একেবারে কসে তা'র রস নিঙরে নেবেন।" এই কথা বলে তিনি ফ্যা ফ্যা করে হাসতে হাসতে রেগিণাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন।

রেগিণার মন দমে গেল। এ কি বিপদেই না সে পড়ল ! ক্রিষ্টানস্যাণ্ড-এর সেই বুড়ী চেয়েছিল তার কাছ থেকে কিছু

টাকা ঠকিয়ে নিতে। এই সুযোগে যদি তার ভাইকে কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়—তাও বোধ হয় বুড়ীর প্রচ্ছন্ন বাসনা ছিল। খুব স্পষ্টভাবে বুড়ীর উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু এই লোকটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হয়ত জেলা-শাসকের ওপর তাঁর বিলক্ষণ রাগ আছে তাই তাঁকে অহেতুক হয়রাণ করবার জন্যে একটা আজগুবি আষাঢ়ে গল্প বানিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে যাওয়া নিরর্থক হবে না কি? কিন্তু রেগিণা শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলে, যখন অন্য কিছু করণীয় নেই তখন একবার ওখানে নেড়ে-চেড়ে দেখতে ক্ষতিই বা কি?

রেগিণা যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় পৌছুল তখন তার রীতিমত পা কাঁপছে। তার ভয় হ'তে লাগল, এখানেও যদি সে হতাশ হয়। তবুও আশায় বুক বেঁধে সে কলিং বেল টিপলে।

সাদা টুপি পরা একজন বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিলেন। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে রেগিণা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কাছেই আশ্রয় নেবার মত কোন আস্তানার খোঁজ তাঁর জানা আছে কি না!

বৃদ্ধাটি অবাক হয়ে রেগিণার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে ভেতরে এসে বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাকে নিয়ে এসে একটা প্রশস্ত হলঘরে বসালেন। উভয়ের পরিচয়-বিনিময়ের পর মহিলাটি কতকগুলি বোর্ডিং হাউসের ঠিকানা দিয়ে জানালেন, সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে ঐসব আবাসগুলি গ্রীষ্মকালে অতিথিদের আশ্রয় দিয়ে থাকে।

রেগিণা সে সম্বন্ধে বিশদভাবে খোঁজখবর নিতে লাগল। কিন্তু তার চিন্তা, কি ভাবে আসল কথাটা সুরু করা যায়। ভদ্রমহিলার মধুর ব্যবহারে তার সাহস হ'ল। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ ক'রে তার বেজায় লজ্জা করতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল, মহিলাটির গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে সব কথা খুলে বলে। কিন্তু সে সংকল্প তার ব্যর্থ হ'ল, কেননা, কপাল টিপে ধরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন, "আমাকে আজ কিন্তু মাপ করতে হবে—আজ আমি বড়ই ক্লান্ত।"

ইঙ্গিতটা খুবই সুস্পষ্ট। বেগিণা উঠি উঠি করছে এমন সময় মহিলাটি আবার বললেন, "কাল আমাদের সারারাত বিনিদ্র অবস্থায় কেটেছে কিনা!"

রেগিণা রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, "বিশেষ কোন কাজ ছিল বুঝি?"

মহিলাটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমাদের বাড়ীতে একটি ছোট্ট খোকা ছিল—ছেলেটি কাল আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল" এই বলে মহিলাটি তাঁর সিল্কের ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলেন।

বহুদিনের অভ্যাসের দরুণ রেগিণার ধৈর্যধারণের এক সহজাত ক্ষমতা এসে গিয়েছিল। সে যথাসম্ভব মানসিক উত্তেজনা দমন করে জিজ্ঞাসা করল, "ছেলেটি কি আপনার নাতি?"

"না, তেমন কোন আত্মীয় নয়, তবে...

রেগিণা হঠাৎ করমর্দনের জন্যে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে

দিয়ে বলে উঠল, "আমি এ দুর্ঘটনার কথা জানতাম না, জানলে এ বিপদে আপনাদের কোন মতেই বিরক্ত করতে আসতাম না।"

যাবার জন্যে রেগিণা পা বাড়াল, কিন্তু দু' এক পা এগিয়েই পুনরায় ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, "ছেলেটির কত বয়েস হয়েছিল ?"

"সবে দু' বছরে পড়েছিল।"

"ছেলেটিকে কি আপনি দত্তক নিয়েছিলেন ?"

রেগিণা এইবার শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। এইবাব বুঝি সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। মহিলাটি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক দু' বছর আগে একটি প্রসূতিসদন থেকে এক রকম কুড়িয়ে এনেছিলাম তাকে। আমাদেরই একজন হাউসকিপাব ক্রিশ্চিয়ানায় গিয়ে—কিন্তু যাক্ সে সব কথা।"

রেগিণা এতক্ষণ হাঁ করে মহিলাটির কথাগুলো গিলছিল। শেষের কথাটিতে তার প্রাণ ফিরে এল। মনে মনে বললে, ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ! আমার ছেলেটি তা' হলে নয়। প্রকাশ্যে বললে, "আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বিদায়!"

সন্ধ্যার পর রেগিণা হোটেলের বারান্দায় বসে দূর বনানীর দিকে চেয়ে ছিল। হোটেলের খানা-কামরা থেকে হৈ-হল্লা, গাল-গল্পের ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরো ভেসে আসছে। বোর্ডাররা বিভিন্ন ভাষায় গল্প জুড়ে দিয়েছেন। তাঁরা আনন্দ করছেন,

খানা-পিনা করছেন। রাত্রেও তাঁদের সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে না। তাঁদের বুকে তো আর ভারী, টন্‌টনে বেদনা চেপে বসে নি!

কিন্তু হাউস্‌কিপারের গল্পটা কি বানানো? যদি তাই হয়, রেগিণা এখুনি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পঙ্গু হয়ে শুয়ে পড়বে—কোথাও ছুটে পালাবার শক্তি পর্যন্ত তাব অবশিষ্ট থাকবে না। এতদিন পর্যন্ত যে অশুভ ছায়া তাকে সর্বদা অনুসরণ ক'রে ফিরছে সেই ছায়া তাকে গ্রাস কবে ফেলবে। রেগিণা মনকে দৃঢ় কবে ভাবতে চেষ্টা করলে, না, না, আমার সন্তানটি নিশ্চয়ই জীবিত আছে আর ঐ যে ছেলেটি মারা গেছে ওটি তাঁদের হাউস্‌কিপারের। বৃদ্ধা মহিলাটি কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না। ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনও তার ঘুরে বেড়াবার শক্তি আছে, এখনও তার টাকাব সাচ্ছল্য আছে। চল্‌তি পথে হয়ত বহুবার পায়ে কাঁটা ফুটবে—কিন্তু তা'তে ভয় পেলে চলবে না। এই কৃচ্ছ্র্‌সাধনের পথে যদি তার কিছু পাপ ধুয়ে-মুছে যায়!

কিন্তু অতঃপর কোথায় যাবে সে? যদি পরামর্শ দেবার মত একজন বন্ধুও থাকত তার! তার সমস্ত সামাজিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই বিশাল ও হিংসাত্মক পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা! মনের চিন্তা প্রকাশ করবার উপায় নেয়, সান্ত্বনা দেয় এমন বন্ধু নেই। সত্য পথের সন্ধান সে কি কোন দিনই পাবে না?

মধ্যবাত্রি পর্যন্ত বেগিণা সেই বারান্দাটিতে নিশ্চলেব মত বসে রইল। অন্যান্য সবাই শুয়ে পড়েছে। সহরের কোলাহল এখন শান্ত হয়ে এসেছে। তটপ্লাবী নদীব শব্দ এত দূব থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বাত্রি যেন দিনেব মত হাল্‌কা। লঘু মেঘখণ্ডগুলি এখনও স্তব্ধ আকাশকে ক্ষীণভাবে আলোকিত কবে রেখেছে।

ইতিপূর্বে ক্রিষ্টানস্যাণ্ড্‌ থেকে রেগিণা টেলিগ্রাম কবে নির্দেশ দিয়েছিল, খবরেব কাগজের অফিস থেকে যেন তার চিঠিগুলি মোল্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পবদিন প্রত্যূষে পোষ্টঅফিসে গিয়ে দেখল, তাব নামে আরও তু'খানা চিঠি এসে গেছে।

কুড়ি

সেই দু'খানা চিঠির সূত্র ধরে রেগিণা প্রথমে ট্রন্‌ডজেম ও পরে নর্ডল্যাণ্ড-এ ছুটে গেল। আবার সে আশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল। আবার যে আশা করতে সাহস হচ্ছে এতে সে খুসীই হয়ে উঠল। কিন্তু আশাভঙ্গ হতে আবার নতুন করে সে ভেঙ্গে পড়ল।...নর্ডল্যাণ্ড-এর চিঠিটায় হয়ত কিছু কাজ হলেও হতে পারে ভেবে আবার তার বুকে বল ফিরে এল। তার সন্দেহ হতে লাগল তার স্বামীর এর মধ্যে কিছুটা হাত থাকলেও থাকতে পারে। বুকে নতুন আশা নিয়ে সে উত্তরমুখো ছুটে চলল। এবারেও সে অকৃতকার্য হ'ল বটে কিন্তু নতুন একটা সূত্র পেয়ে তার মনে হ'ল তার কষ্ট সার্থক হয়েছে। সে ভাবলে, দেখা যাক্ এবার সন্ধান মেলে কিনা!

এখন থেকে রেগিণার এক অদ্ভুত জীবন সুরু হ'ল। কোথাও স্থির হয়ে বসবার উপায় নেই, সর্বদা তার জীবন কাটে পথে পথে। ক্রমান্বয়ে আশা আর হতাশার পরস্পর-বিরোধী স্রোতে গা ভাসিয়ে তার দিন কেটে যায়। মনে করে এইবার শেষ, আর তাকে ধাক্কা খেতে হবে না। কিন্তু প্রতিবারই অসাফল্যের গ্লানিতে তা'র জীবন ভরে ওঠে। বিশ্রামের তোয়াক্কা না করে পুনরায় উদ্দাম গতিতে সে তার শঙ্কিত পরিক্রমা সুরু করে দেয়।

হেমন্তের শেষে একদিন সে খোঁজ পেলে একজন ডাক্তার নাকি একটি পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। হলদে পাতাওয়ালা গাছের

ফাঁক দিয়ে আর গো-চারণ ভূমি ও শস্যভূমির পাশ দিয়ে বহে যাওয়া একটি ছোট্ট নদীর পাশ দিয়ে সে চলেছে। রাস্তায় যখন বরফ পড়ছে তখন সে চলছে স্লেজ্‌ গাড়ী করে টোটেন সহরের ওপর দিয়ে। কে একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।

রেগিণার ধারণা হ'ল সকলেই তার পরিক্রমার আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছেন এবং সর্বদাই তার কাছে সত্য গোপন করে চলেছেন। যাঁরা তার ছেলেকে মানুষ করছেন তাঁরা সযত্নে সমস্ত তথ্য তার কাছ থেকে গোপন করতে চেষ্টা করছেন এমনকি ইচ্ছে করে আক্রোশবশে তাকে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। যতই এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হ'ল ততই সে নিষ্ফল আক্রোশে সেই সব লোককে ক্রমাগত খুঁজে বেড়াতে লাগল, যাঁরা তার সারা জীবনটাকে ব্যর্থতায় ভরিয়ে দিয়েছে। কত দিন যে সে বিশ্রামের মুখ দেখেনি মনেই পড়ে না।

বড়দিনের পর আবার সে ট্রেনে চেপে চলেছে ওস্‌টারডালের ভেতর দিয়ে। গাছের চিক্‌চিকে ডাল-পালার দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। এটর্নির সঙ্গে অবিলম্বে তার দেখা করা দরকার।

এতদিন রেগিণা তার গুপ্ত বেদনার কথা নিজের মনে চেপে রেখেছিল। এবার সেই গুপ্ত কাহিনী সে সবত্র বলে বেড়াতে লাগল, একে, ওকে, তাকে। দেখাই যাক্‌ না, তাতে যদি কিছু উপকার হয়! সে যথেচ্ছভাবে জলের মত টাকা ব্যয় ক'রে, এ এটর্নি, সে এটর্নিকে নিযুক্ত করতে লাগল। যখনই তার

কানে এল অমুক এটর্নির বেশ নাম-ডাক আছে, অমনি সে দৌড়ে তার কাছে গেল। তাঁরা সকলেই প্রসূতি-সদনে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন কিন্তু তাতে কিছুই ফল হলনা কেননা সেখানকার বই-পত্র থেকে কোন হদিশ পাওয়া গেল না। প্রফেসরই একা সমস্ত জানতেন। রেগিণা নিজেও বলতে পারল না, ছেলেটির কি নাম, ছেলেটিকে যাঁরা দত্তক নিয়েছেন তাঁদেরই বা কি নাম বা বাড়ী কোথায়। এমনকি তাঁদের বাড়ী নরওয়েতে না আর কোথাও সে সম্বন্ধেও সে কোন আভাস দিতে পারল না।

এটর্নিরা সবাই তাকে পরামর্শ দিলেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে। কিন্তু কতকাল আর সে ধৈর্য ধরে থাকবে? কে জানে আর কতদিন তার আয়ু! সুতরাং অনতিবিলম্বেই তার ছেলেটির সন্ধান পাওয়া দরকার। অবশেষে সে প্রতিজ্ঞা করলে, আর কারও ওপর নির্ভর না করে সে নিজেই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। সে আরও যদি সতর্ক হয়, তাহলে একদিন না একদিন সে তার ছেলেকে খুঁজে পাবেই পাবে।

একদিন তার হাসপাতালের বিগত দিনগুলির ক্ষীণ স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। ঠিক! ঠিক!! একদিন হাসপাতালে থাকতে হঠাৎ জেগে উঠে সে যেন প্রফেসরের সঙ্গে দু'জন অপরিচিত ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে দেখেছিল। তাঁরা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁরা তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু

কেমন যেন দেখতে তাঁদের ? সে বহু চেষ্টা করেও তাঁদের মুখ মনে করতে পাবল না। এইটাই একমাত্র সূত্র। যদি সে তাদের চেহারাটা একবার মনে করতে পারত ! ঘরেব সে দিনের দৃশ্যটা মনেব মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা কবতে লাগল। সে ভদ্রলোকটির নাক, দাড়ি, জামাকাপড়, চুল ইত্যাদি কেমন মনে করতে চেষ্টা করল। তার মনে হল পুরুষ মানুষটিব চেহারাটা সে যেন কিছু কিছু মনে করতে পারছে। আরও কিছুক্ষণ পরে তাব ধ্রুব বিশ্বাস হ'ল ভদ্রমহিলাটিকেও সে হুবহু মনে কবতে পারছে। এখন দুজনকেই সে স্পষ্ট চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাঁদেব ? এখন একমাত্র প্রয়োজন তাঁদের খুঁজে বার করা। আর সে তা' কববেই, যেমন কবে হ'ক। এখন সে যখন তাঁদেব হুবহু বর্ণনা দিতে পাবে তখন তাঁদেব খুজে বাব করাটা আর তত কঠিন হবে না।

তারপর থেকে সে এমন সব লোকেব সংস্পর্শে আসতে লাগল যারা এই সুযোগে বেশ দু' পয়সা কামিয়ে নিল। বেগিণা যেন ইচ্ছে করেই তাদের ফাঁদে ধরা দিতে লাগল। সামান্য একটা আশার পেছনে সে অজস্র অর্থ ব্যয় করে ফেললে যদিও তার ধ্রুব ধারণা হোল যে সবাই তাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। খুঁজে বেড়াবাব যে আর একটা নতুন সূত্র পাওয়া গেল এতেই সে খুসী। এই নতুন সম্ভাবনাগুলি যেন তার নির্বাপিত প্রায় ক্ষুদ্র প্রদীপটিতে কয়েক ফোঁটা তৈলদানের মত কাজ ক'রে তার আশার

প্রদীপটিকে পুনরায় প্রদীপ্ত আলোকশিখা বিকীরণে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগল।

এইভাবে সপ্তাহ ও মাসগুলি দ্রুত কেটে যেতে লাগল। প্রতিবারের অসাফল্যের জন্য তাব মুখে নতুন নতুন কুঞ্চিত রেখার সমাবেশ হ'তে লাগল। তা'র একদা কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত কেশদাম সাদা সাদা টানায় ভরে উঠল। ক্রমশঃ তা'র বয়স অনুমান করা এক শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সে বৃদ্ধা কি যুবতী তা' নিরূপণ কবা যেন প্রায় অসাধ্য ব্যাপাব হয়ে দাঁড়াল।

এখন থেকে সে যা কিছু দেখত ও যা কিছু শুনত সবই সেই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। পৃথিবীতে ঐ দু'টি ক্রিয়া ছাড়া আব কোন কিছুব যেন অস্তিত্ব নেই।......ট্রেনেব কামরায় দু'জন লোকের সাধাবণ কথাবার্তা থেকে সে নতুন নতুন সূত্র খুঁজে বার করতে চেষ্টা করত। যেখানেই সে যেত, যাকেই সে দেখত— সবই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করত। সর্বদা আশা করত, এই বার বোধ হয় সে সেই দুটি প্রাণীব সন্ধান পাবে। এতদিনে তাঁরা দুজনে তার মানস চক্ষে অতি-পরিচিত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন।...কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই তাব মনে হতে লাগল এই বার সে খাড়া পাহাড়ের ঠিক প্রান্তদেশে এসে পৌঁছেছে। আর সম্মুখে দেহ প্রসারিত করবার কোন উপায় নেই। এখন আব স্বীকাব না কবে উপায় নেই যে সে একজন নিরপরাধীকে অনর্থক হত্যা করেছে......।

এমনি অবস্থায় একদিন রেগিণা তার ষ্টেটের উকীলের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলে। তিনি জানিয়েছেন যে ফ্ল্যাটেনের বোনেরা সম্পত্তি বিভাগের প্রশ্ন তুলেছেন এবং প্রস্তাব করেছেন যে রেগিণা যাতে তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে না পারে তার জন্য ফ্ল্যাটেনের পুত্রের তরফ হতে তাঁরা এখুনি সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে নিতে চান। সে দিক থেকে পাছে কোন গণ্ডগোল ওঠে এই ভয়ে রেগিণা তাঁদের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। কিন্তু তার মনে হতে লাগল এইবার ঝড়ের পূর্বসূচনা সুরু হল। ফ্ল্যাটেনের পুত্রের দিক থেকে এ যেন প্রথম স্বাধীন প্রতিবাদ। ছেলেটির বয়েস বাড়ছে। আর দেরী নেই। এইবার সে একদিন এসে পড়ল বলে! একদিন না একদিন সে আসবেই তার পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে। সে দিন আর খুব দূরে নেই! এর মধ্যেই যা' হোক কিছু একটা করা দরকার!

একুশ

এমনি ভাবে দিন যায় আব আসে।

একদিন বেগিণা হোটেলের স্যাঁস্‌নেসে বিছানায শুযে ঠক্‌ ঠক্‌ কবে কাঁপছে আব বাইবেব অন্ধকাবের দিকে তাকিযে আছে। সে যেন অধ-ঘুম ও অর্ধ-জাগবণেব মধ্যে অবস্থান কবছে। কখনো সে ষ্টীমাবে চডে চলেছে, কিন্তু ষ্টীমাব খুব আস্তে আস্তে চলছে। আবাব কখনও ট্রেনে চেপে চলেছে কিন্তু ট্রেন শ্লথ-মন্থব গতিতে গডিযে গডিযে চলেছে। এবাব আব ট্রেনে চেপে নয়, সে চলেছে পাযে হেঁটে। যতই সে ছুট্‌তে চাচ্ছে ততই তাব পা জডিযে জডিয়ে যাচ্ছে।...পরমুহূর্তেই সে ছুটে চলছে এক জলাভূমিব ওপব দিকে। তাব মাথাব ওপবের ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ আকাশ গাঢ অন্ধকাবে আচ্ছন্ন, কেবল মাত্র ঈষৎ হলদে আলোকে স্বল্প আলোকিত। ঘন কালো মেঘ যেন পবস্পব পবস্পবকে ভীষণ আক্রোশে তাডা কবছে। আব বেগিণা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটাব প্রতিকূলে ছুটে চলেছে। হঠাৎ পেছন থেকে পদশব্দেব আওযাজ তা'ব কানে ভেসে এলো। এ পদশব্দ তা'ব অপবিচিত নয়। সে আবও জোবে ছুটে চলেছে। পেছন ফিবে তাকাতে সাহস হচ্ছে না কিন্তু সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, প্রকাণ্ড বড একটি মুখ, ধূসব এক জোড়া গোঁফ এবং শান্ত একজোডা চোখ। সে তাব কোন ক্ষতি কবতে চায় না। কেবল বলতে চায়, 'আমি তোমাকে ক্ষমা

করেছি'। চীৎকার ক'রে বলছে, "প্রিয়তমা পত্নী আমার,—অত ছুটোনা, একটুখানি অপেক্ষা করো, আমি কেবল তোমাকে বারেক চুম্বন ক'রে বলতে চাই, আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছি। একথা ঠিক যে আমি সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম ক'রে যে অর্থ সঞ্চয় করেছি, তা তুমি হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছ। কিন্তু তা'তে আমি ক্ষুব্ধ নই। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না যে আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি?"...

কিন্তু রেগিণা ছুটে চলেছে তো চলেছেই। যেমন করে হোক সেই প্রেতধ্বনি থেকে মুক্ত হওয়া চাই। তার মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল। যাঁদের সে চোখের সামনে দেখছে তাঁরা কেউ কেউ বা মৃদু সস্নেহ-স্বরে কথা বলছেন, কেউ বা রক্তরাঙা চোখ দেখিয়ে চীৎকার ক'রে ভর্ৎসনা করছেন। একবার যদি সে থেমে পড়ে, তাঁরা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সুতরাং বিশ্রাম নয়, তাকে অবিশ্রান্ত ছুটতে হবে। কিন্তু যতই সে ছুটতে চেষ্টা করছে ততই তার পা জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। শত চেষ্টাতেও সে এক পাও এগুতে পারছে না।... ..

হঠাৎ রেগিণা চম্‌কে উঠে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে খাটের প্রান্তে চুপচাপ বসে রইল।

—ওঃ, এতক্ষণ আমি তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম? রাত মাত্র একটা। কিন্তু এ ভাবে আর কতদিন বাঁচব? আমার জীবনের গতি কি ফিরিয়ে ফেলতে পারি না? আমি কি পারি না এই

দারুণ দুঃখের অভিশাপ চিরতরে কাটিয়ে উঠতে ? পারি, যদি চিরদিনের জন্যে সব আশা ত্যাগ ক'রে, অকপটে আত্মসমর্পণ করি আমার দুর্বার নিয়তির কাছে। কিন্তু তারপর ? আমার এতদিনের পরিশ্রম কি বৃথা যাবে ? আমি কি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকব না, যেখান থেকে আমি আমার এই অশুভ পরিক্রমা প্রথম আরম্ভ করেছিলাম ? না, সে অসম্ভব। যতদিন বাঁচব ততদিন আশা ছাড়ব না – ছেলেকে খুঁজে বার করতেই হবে !

কিন্তু আজ রাত্রেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাঁর মুখ যদি আবার দেখতে হয় এবং আবার তাঁর মুখ থেকে শুনতে হয় "ওগো, আমি তোমায় ক্ষমা করেছি," তাহলে ? না, তা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। ওঃ ! যদি জানবার কিছুমাত্র উপায় থাকত, এই পৃথিবীর পরপারে অপর একটি পৃথিবী আছে কিনা ? মানুষের জন্মান্তরবাদ কি সত্যি, না মানুষ মরে গিয়ে ধোঁয়ায় মিশে যায় ? কে বলতে পারে সে কথা ? কেউ কি বলতে পারে না ?

এই যে জীবন, এ কতই না বিচিত্র ! এ যেন সূচ্‌ ফুঁরে ফুঁরে সন্তর্পণে সূচের কাজ ক'রে চলেছে। হাতে সুতো ধরাই আছে। একটি মাত্র ভুল করেছ কি, আর রক্ষা নেই, ক্ষমা নেই। কোন রকম মেরামতী চলবে না, দামী সূচের গোটা কাজটায় নষ্ট হয়ে যাবে !...কিন্তু ভুল ? সত্যিই আমি ভুল করেছিলাম কি ? কতখানি দায়ী ছিলাম আমি নিজে, সেই ভুলের জন্যে ? হায় ! তখন যদি আমার আর পাঁচ ক্রোণার বেশী থাকত, তা'হলে আজ আর এ দুর্দশা হ'ত না। মাত্র পাঁচ ক্রোণার ! হাসপাতালের

দেনা তখন কোন গতিকে যদি মেটাতে পারতাম ! কিন্তু আব কখনই সে জীবন ফিরে পাব না।

এখন আমি এখানে পড়ে আছি, ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনো কিছুটা আশা বাকী আছে। আরও কিছুদিন ধৈর্য ধবে থাকা দরকাব হয়ত আগামীকাল সব কিছু ঠিক হযে যাবে। কিন্তু তাবপব ? তাবপব সব কিছু গ্লানি ভুলে গিযে আমি সকলকে ধন্যবাদ দেবো—সকলকেই প্রশংসা কবব।

কিন্তু এখন যে আমি এখানে শুযে শুযে সময নষ্ট কবছি, শিশুটি যদি সত্যিই সেই ধম যাজকটিব কাছে থেকে থাকে ? হযত সে সাংঘাতিক অসুস্থ হযে পড়েছে, কে বলতে পা.ব, আজই তার মৃত্যু হবে কিনা। আব আমি কিনা এখানে ঘুমিযে ঘুমিযে সময় কাটাচ্ছি ? ওঃ, আমি নিশ্চযই পাগল হযে যাব।

রেগিণা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজাল। তাডাতাডি সে জামা কাপড় পড়ে নিলে। আবার সে ঘণ্টা বাজালে . আবাব। বহুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল।

"এখুনি একখানা গাড়ী ডেকে দাও।"

"গাডী ? এখন ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ যে রাত্রিকাল তা' আমি জানি। দরকার হ'লে ডবল ভাড়া দেবো। কিন্তু গাডী আমাব এখুনি চাই, যেমন করে হোক।"

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দে সেই নৈশ নীরবতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

* * *